আগস্ট ২০২৫ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

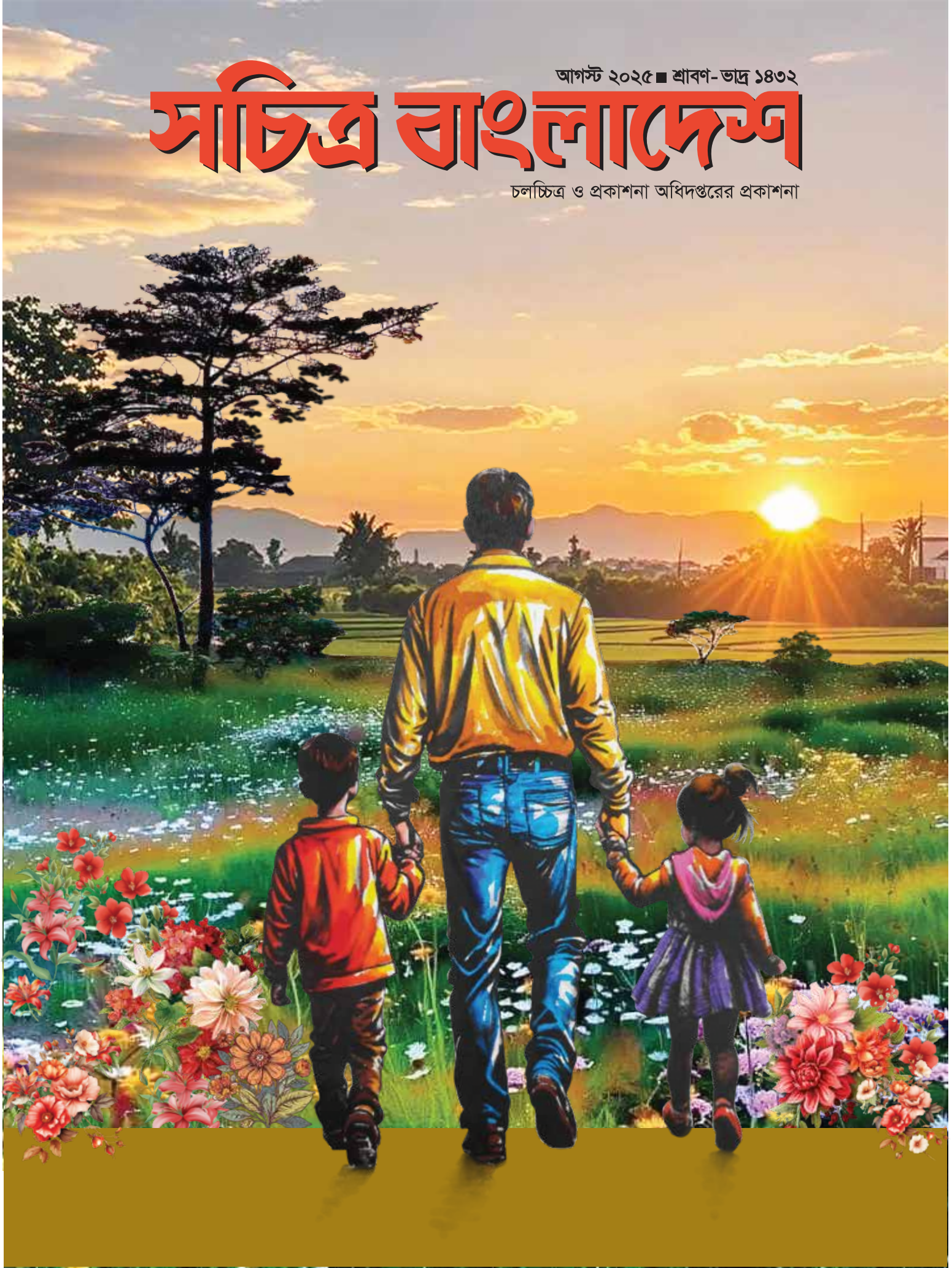

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৫ই আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে গণভবনে নির্মাণাধীন 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' পরিদর্শন করেন- পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট ২০২৫ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৫ই আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী খাম এবং জুলাই স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

৫ই আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববানকে প্রত্যাখানের ঐতিহাসিক দিন। ২০২৪ সালের এই দিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত আপামর ছাত্র-জনতাকে, যাঁদের আত্মত্যাগে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সূচনা হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে প্রধান উপদেষ্টা সকল নাগরিককে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন– যাঁদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই অতি মূল্যবান অধিকার ফিরে পেলাম, ভোটটা দেবার আগ মুহূর্তে যেন তাদের মুখ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে।

স্লোগান যে-কোনো আন্দোলনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও শ্রুতিগ্রাহ্য প্রকাশভঙ্গি। এটি শুধু একটি বাক্য নয়, বরং এটি একইসঙ্গে ভাষা, আবেগ, চেতনা ও প্রতিরোধের এক সংগীত। সমাজের অনিয়ম, নিপীড়নে মানুষ যখন রাস্তায় নামে, তখন তারা প্রথমে যা খোঁজে তা হলো– একটি ভাষা, যার মাধ্যমে তারা প্রতিবাদ জানাতে পারে। এ ভাষাই স্লোগান। শেখ হাসিনা সরকারের নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের সর্বব্যাপী বিস্ফোরণ ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। শ্রমজীবী, কৃষক, পোশাকশ্রমিক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং তাদের আবেগ, বেদনা ও প্রতিরোধের মনোভাব প্রতিফলিত হয় স্লোগানগুলোতে। এই স্লোগান নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে এবারের সংখ্যায়।

বিশ্ব সংগীতের ইতিহাসে সুর ও বাণীর অমিয় বরপুত্রের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের গানের বাণী ও সুর বৈচিত্র্যের যে গভীরতা ও উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই আমাদের সামনে আসে, তা এক কথায় অনির্বচনীয়। বৈচিত্র্যের মানদণ্ডে নজরুল সংগীতের কথা যেমন উচ্চতাসম্পন্ন বিষয় ও ভাবরস নির্ভর; তেমনি সুর ও প্রাচ্যদেশীয় অগুনতি রাগ-বৈচিত্র্যের এক গভীর লীলাখেলার নির্মল নির্যাস। অতিশয় প্রান্তিক গ্রামীণ জীবনের চাষাভুসার গেঁয়ো জীবনভিত্তিক সংগীত রচনা থেকে শুরু করে বাংলা সংগীতের বহুবৈচিত্র্যশীল পথ-মাঠ-ঘাট পেরিয়ে উচ্চশিক্ষিত, সংগীতানুরাগী ও সুধী সমাজে স্বীকৃত সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাবানদের সংগীতায়োজনের জন্য উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনা– সর্বক্ষেত্রেই নজরুল বিষয়ভিত্তিক কথা ও সুরের অগণিত সাংগীতিক রুট সৃষ্টি করেছেন অবলীলায়। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে সংঘটিত কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও জনগণের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের গান, কবিতা ও লেখনি ব্যাপকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা ও গানে অন্যায়, শোষণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে যা আন্দোলনকারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

নজরুলের সাহিত্যকর্ম শত বছর আগের হলেও এর প্রতিবাদী সুর আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। জুলাই আন্দোলন প্রমাণ করেছে, তাঁর এই সাহিত্য এখনো মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ সংখ্যায় থাকছে নজরুলের ওপর বিশেষ নিবন্ধ ও কবিতা।

কবি রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বিশ্বকবি। বাংলা ভাষায় তিনি শ্রেষ্ঠতম লেখক; ভাষা তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল। এ সংখ্যায় আছে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সমাজ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ।

এছাড়াও এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* আগস্ট সংখ্যায় থাকছে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ফিচার। আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/ফিচার/গ্রন্থ আলোচনা

৫ই আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে' জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

ঐতিহাসিক ৫ই আগস্ট: বিজয় ও অঙ্গীকার ১১
অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান

জুলাই চেতনার বহ্নিশিখা ১৩
হাসান হাফিজ

সুশাসন সুশাসনের স্বার্থেই ১৭
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

বর্ষপূর্তিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ১৯
ড. মো. মনিরুজ্জামান

জুলাই অভ্যুত্থানে প্রবাসী ও বিদেশিদের ভূমিকা ২১
মো. গোলাম ফারুক মজনু

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সমাজ ২৭
প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কাঁচ-ভাঙ্গা রাতের গল্প: প্রকৃতির শব্দ খোঁজেন রূপা ৩০
ড. শিহাব শাহরিয়ার

নজরুলের *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থ: শতবর্ষে মানবতার জয়গান ৩২
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

নজরুল, বাঙালি পল্টন এবং ঢাকা প্রসঙ্গ ৩৭
অনুপম হায়াৎ

নজরুলের স্বদেশি গান: চেতনায় অনির্বাণ জাগরণ ৩৯
আলী হাসান

বন্ধু শাশ্বত এক বিশ্বস্ত সারথি ৪২
ড. সবুজ শামীম আহসান

নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহ ৪৫
আজহার মাহমুদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্লোগানগুলো ৪৮
মুহাম্মদ ইসমাঈল

আসুন বৃক্ষরোপণ করি ৫১
মোহাম্মদ আলী সরকার

জুলাই আন্দোলনের বীর: শহিদ সাজ্জাদ হোসেন ৫৪
মিয়াজান কবীর

নকশি পাখা: বাংলাদেশের লোকজ শিল্প ৫৬
জায়েদুল আলম

স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখি ৬০
মেজবাউল হক

নীরবে শরীরে বাসা বাঁধে হেপাটাইটিস ৬২
মোসা. আলেয়া রহমান

মায়ের দুধ পান সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ ৬৪
কামরুল ইসলাম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম (আগস্ট-২০২৫) ৬৬

গল্প:

গজওয়ান ফার্মেসি ৬৮
জুয়েল আশরাফ

সুখ ৭৫
আবু বাকার

কবিতা: ৭২-৭৪

ফারহানা আলী মিষ্টি, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, অদ্বৈত মারুত আসাদুজ্জামান খান মুকুল, কামাল হোসাইন, ওমর ফারুক নাজমুল, তারিকুল আমিন, শামীম শাহাবুদ্দীন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৫ই আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন– পিআইডি

৫ই আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে' জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ ৫ই আগস্ট, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। এক বছর আগে এ দিনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পূর্ণতা পায়, দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয় প্রিয় স্বদেশ।

গত বছরের জুনে আদালতের একটি রায়ে সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল হলে দেশের তরুণ শিক্ষার্থী সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের এই ক্ষোভ দাবানলে পরিণত হয় স্বৈরাচারের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে, দমন-পীড়নে, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, নির্মম হত্যাযজ্ঞের কারণে।

স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশে পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের সামনে নির্ভিকচিত্তে দাঁড়িয়েছিল এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। তাঁদের সম্মুখভাগে ছিলেন আমাদের অদম্য নারীরা। দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা।

আজকের দিনে আমি জাতির সূর্য সন্তান জুলাই শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

জুলাইয়ে যারা আহত হয়েছেন, চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন, দৃষ্টি হারিয়েছেন জাতির পক্ষ থেকে আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

গত এক বছরে আমরা অনেক সংকট ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে পার করেছি। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের গভীরভাবে বেদনাহত করেছে। সর্বশেষ মাইলস্টোন কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ঝরে গেছে আমাদের কোমলমতি শিশুসহ বেশকিছু মানুষের প্রাণ। আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন অনেকেই। এ ঘটনা আমাদের সবাইকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। যারা এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর, চীন, ভারতসহ কয়েকটি দেশের

যে-সকল চিকিৎসক এবং নার্স আহতদের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাঁরা রক্ত দিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের প্রতিও।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমরা অনেক দূর পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে, সংকট দূর হয়েছে।

মাত্র কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা সফলতার সঙ্গে শুল্ক আলোচনা সমাপ্ত করেছি। এর ফলে আমাদের অর্থনীতির সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

যখন এক বছর আগে আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৬ বছরব্যাপী একটানা ধ্বংসযজ্ঞ এবং লুটপাটে বিধ্বস্ত এক অর্থনীতির দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন কারোরই মনে হচ্ছিল না এই বিধস্ত অর্থনীতিকে আবার সহজে চালু করা যাবে। মাত্র এক বছরের মধ্যে আমরা এতদূর রাস্তা অতিক্রম করতে পারব যা চিন্তাই করা যায়নি। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবার পালা। আমরা এখন অন্তর্বর্তী সরকার থেকে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের চার মাসের মাথায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে দেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করব। তবে নির্বাচনের আগে আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জুলাই ঘোষণাপত্র ও জুলাই সনদ।

আজ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে, সকল রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা জাতির কাছে জুলাই ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেছি। এই ঘোষণাপত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের মানুষের অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের তিনটি দায়িত্ব ছিল: সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা দেয়ালে দেয়ালে যে প্রত্যাশার কথা লিখে রেখেছিল তার অন্যতম ফোকাস ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার। সে লক্ষ্যে আমরা বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলাম। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার কমিশনগুলো যে সুপারিশ পেশ করেছে সেগুলোর মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য বহু সংস্কার আমরা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছি।

এই সংস্কারগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক খাত, বিচার ব্যবস্থা ও জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আসবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানি হ্রাস পাবে।

দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছিলাম।

এই কমিশনে ৩০টিরও অধিক রাজনৈতিক দল ও জোট স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মতামত দিয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ঐকমত্য কমিশন ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রায় দুই মাস ধরে দলগত ও জোটগতভাবে আলোচনা করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো বাদ দিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে ১৯টি মৌলিক সংস্কারের বিষয় চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৩ দিন ধরে আলোচনা শেষে ১৯টি বিষয়ের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে।

সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি। ঐকমত্য কমিশনের পরিচালনায় দেশের সকল রাজনৈতিক দল মিলে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে 'জুলাই সনদ' চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে এসেছে।

জুলাই সনদ একটি ঐতিহাসিক অর্জন। এটা শুধু আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, বৃহত্তর পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দলিলতো স্মরণীয় হয়ে থাকবেই, এটা রচনার প্রক্রিয়াও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দলিল প্রণয়নের জন্য আমি সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এবং ঐকমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দকে বিশেষ করে এই উদ্যোগের নেতৃত্বদানকারী প্রফেসর আলী রীয়াজকে জাতির পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা ছিল। আমরা আশা করছি এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে অচিরেই রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে এবং এর বাস্তবায়নেও ঐকমত্যে পৌঁছাবে।

জুলাই সনদ বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা ও সক্ষমতা, নাগরিক অধিকারের সত্যিকারের বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে ভবিষ্যতের কোনো সরকারই যেন আর ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারে। রাষ্ট্রকে এমনভাবে মেরামত করতে হবে যাতে কখনো কোথাও ফ্যাসিবাদের লক্ষণ পাওয়া গেলেই সেটিকে যেন তাৎক্ষণিকভাবে সেখানেই নির্মূল করা যায়। আর যেন ১৬ বছরের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। বহু মানুষকে প্রাণ দিতে না হয়। আমাদের যেন আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন না হয়।

জুলাই-আগস্টের মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় বিচারকাজ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। বিচারের আনুষ্ঠানিক শুনানি পর্বও শুরু হয়েছে। ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞে যারা জড়িত তাদের বিচার এ দেশের মাটিতে হবেই।

বিচার প্রক্রিয়া ও এর ফলাফল ক্রমান্বয়ে মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে থাকবে। বিচারের পুরো প্রক্রিয়া দেশবাসীর কাছে স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান রাখা হচ্ছে।

এবার আমাদের সর্বশেষ দায়িত্ব পালনের পালা। নির্বাচন অনুষ্ঠান। আজ এই মহান দিবসে আপনাদের সামনে এ বক্তব্য রাখার পর থেকেই আমরা আমাদের সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। আমরা এবার একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করব।

অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠাবো, যেন নির্বাচন কমিশন আগামী রমজানের আগে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

আপনারা সকলেই দোয়া করবেন যেন সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এ দেশের সকল নাগরিক একটি 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার কাজে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখরভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করব।

এবারের নির্বাচন যেন আনন্দ-উৎসবের দিক থেকে, শান্তি-শৃঙ্খলার দিক থেকে, ভোটার উপস্থিতির দিক থেকে, সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতার দিক থেকে দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে সেজন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে আগামীকাল থেকে আমরা সকলেই মানসিক প্রস্তুতি ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন শুরু করব।

নির্বাচনে ভোটারদের সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে চাই। এবার আমরা প্রবাসী ভোটারদের ভোট দেওয়ার আয়োজন নিশ্চিত করতে চাই।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ যে আবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে তার বড়ো কারণ হলো আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ঐতিহাসিক অবদান। নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নারী ভোটাররা যেন দেশের সর্বত্র নির্দ্বিধায় আনন্দ-উৎসাহ সহকারে তাদের ভোট দিতে পারে এটা নিশ্চিত করতে চাই। এবার যেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে নারী ভোটারদের ঢল নামে আমরা সেই লক্ষ্যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার কারণে গত ১৫ বছর ধরে নাগরিকবৃন্দ ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে আমরা আমাদের বকেয়া আনন্দসহ মহা আনন্দে ভোট দিতে চাই। এবারের নির্বাচনে জীবনে প্রথমবার ভোট দিতে যাবে এরকম ভোটাররা নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবে, তাদের এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য। এর মধ্যে নতুন নারী ভোটার থাকবে, নতুন পুরুষ ভোটার থাকবে। এর মধ্যে এমন ভোটার থাকবে যারা ১৫ বছর আগে থেকেই ভোট দিতে পারত কিন্তু জীবনে একবারও ভোট দিতে পারেনি। এর মধ্যে আসবে যারা ১০ বছর আগে, ৫ বছর আগে ভোট দিতে পারত কিন্তু পারেনি। আর আসবে ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীর দল যারা এই প্রথমবার ভোটার হওয়ার যোগ্যতা লাভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোট দেওয়ার সুযোগও পেয়ে গেল।

নির্বাচনের দিনকে আমরা ঈদের উৎসবের মতো করতে চাই। এবারের ভোটের আনন্দ থাকবে সবার মধ্যে। আপনারা সবাই বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন।

নাগরিক অধিকার প্রয়োগের মহা আনন্দ পরবর্তী বংশধরদের কাছে তুলে ধরার জন্য।

এখন থেকে প্রতিদিন আলাপ করুন, আপনার এলাকায় ভোটদান ব্যবস্থা কেমন হলে সুন্দর হয়, কেমন হলে আনন্দমুখর হয়, সেটা আগে থেকে ঠিক করার জন্য। নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজের ভিত্তি রচনা হবে এবারের নির্বাচনে। তার জন্য প্রস্তুতি নিন।

প্রিয় দেশবাসী,

দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যতগুলো বড়ো সংঘাত, সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার সবগুলোর নেপথ্যে কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোনো দল যদি গায়ের জোরে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসে তার চূড়ান্ত পরিণতি কী তা জুলাই অভ্যুত্থান আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

আমরা ইতিহাসের কলঙ্কিত কোনো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি আর করতে চাই না।

আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন, একটা গোষ্ঠী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তারা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে দেশের বাহিরে বসে এবং ভেতরে থেকে নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, তারা যেন নির্বাচনকে সংঘাতময় করে তোলার কোনো রকমের সুযোগ না পায়। মাথায় রাখবেন, পরাজিত শক্তি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। কিন্তু একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন করা গেলে অপশক্তির পরাজয় চূড়ান্ত হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরামর্শ নেবার জন্য আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নেব। এজন্য একটি অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছি। দ্রুত এই অ্যাপটি চালু হবে। আপনারা আপনাদের সকল পরামর্শ, সকল মতামত, সকল আশঙ্কা এবং উদ্যোগের কথা এই অ্যাপের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন।

আমরা তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব, সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নেব।

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আপনাদের নির্বাচনি ইশতেহারে, আপনাদের প্রতিশ্রুতি-প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনায় কোনোকিছুতেই যেন তরুণরা বাদ না পড়ে। নারীরা বাদ না পড়ে। মনে রাখবেন যে তরুণ-তরুণীরা বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছে তারা বিশ্বকেও বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আপনার দল থেকে তাদেরকে সে সুযোগ দেবার উদ্যোগ নিন।

আগামী নির্বাচনে সবাই নিরাপদে যার যার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে এটা নিয়ে কারো কোনো আপত্তির সুযোগ রাখা যাবে না। আমরা সবাই সবার পছন্দের প্রতি সম্মান দেখাব-এটাই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দেশের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা ফসল

উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়েছিল। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ, নজরদারি ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর ফলে এটি এড়ানো গেছে। বিশেষ করে, এ বছরের পবিত্র মাহে রমজান মাস থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে।

মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদের জন্য সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জ। ভঙ্গুর অর্থনীতি ও বন্যার কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছিল প্রায় ১৪ পার্সেন্ট। এখন সেটা অর্ধেকে নেমে এসেছে। আমরা আশা করছি, ডিসেম্বরের মধ্যে এইটি ৬ শতাংশে নেমে আসবে।

এই জুন মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ হয়েছে, যা বিগত ৩৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ নিয়ে চার মাস ধরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে কমেছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি প্রবাসীদের অসীম আস্থার ফলে মুদ্রা বাজারেও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। গত অর্থবছর ব্যাংকিং চ্যানেলে রেকর্ড তিন হাজার ৩৩ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। রপ্তানি আয় প্রায় ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

এর ফলে টাকা শক্তিশালী হয়েছে। অনেক বছর পর ডলারের বিপরীতে টাকার মান বাড়ছে। গত ১১ মাসে বৈদেশিক পাওনাদারদের পাওনা সুদ ও আসল বাবদ ৪ বিলিয়ন ডলার বা ৪০০ কোটি ডলার অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। আগের বকেয়া দায় পরিশোধের পরও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। আগামীতে এ ধারা বজায় থাকবে বলে আমরা আশা করি।

বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার ফলে এই বছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এটা দ্বিগুণের বেশি। আর অক্টোবর থেকে হিসাব করলে ছয় মাসে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এসেছে সাড়ে ষোলো হাজার কোটি টাকা, যা গত সরকারের আমলের শেষ ছয় মাসের তুলনায় দ্বিগুণ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম বড়ো লক্ষ্য। সম্প্রতি হংকংভিত্তিক শিল্পগোষ্ঠী হানডা বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতে আড়াইশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে, যা এখাতে চীনা কোনো কোম্পানির একক সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। তাদের এই বিনিয়োগের ফলে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হানডার এই বিনিয়োগ আরো চীনা কোম্পানিকে এদেশে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করবে। এর মাধ্যমে আমাদের তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের পথ খুলবে। গত ১৬ বছরে দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে গিয়েছে, আমরা সেটা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। এই দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সরকার নামকরা বিদেশি আইনি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিয়েছে। যথাযথ আইনি পদক্ষেপের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী-দুর্বৃত্তরা যে অর্থসম্পদের পাহাড় গড়েছে তার কিছু কিছু ইতোমধ্যে জব্দ হয়েছে। এ কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে আরো কিছু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে ৫ই আগস্ট ২০২৫ 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-২০২৪'-এর শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়— পিআইডি

দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে মজবুত করতে হলে আমাদের চিন্তায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। আমি বরাবরই বলে এসেছি, এদেশের নদী ও বিশাল সমুদ্র আমাদের মূল্যবান সম্পদ। আমরা এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমান্তরালভাবে 'পানিভিত্তিক অর্থনীতি' গড়ে তুলতে চাই।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, বঙ্গোপসাগরের একটা অংশও আমাদের দেশ। এর পরিমাণ আমাদের মোট জমির পরিমাণের চাইতে বেশি। আমরা প্রায় সবসময় জমিভিত্তিক আমাদের অর্ধেক দেশ নিয়ে মাথা ঘামাই। বাকি পানিভিত্তিক অর্ধেক দেশকে হিসেবেই ধরি না। কারণ আমরা ওই অংশে বসবাস করি না। আমরা তো হাওরবাঁওড়েও বসবাস করি না। তাই বলে তো তাকে হিসেবের বাইরে রাখি না।

এখন থেকে আমাদের অংশের বঙ্গোপসাগরকে আমরা আমাদের দেশের মূল্যবান অংশ, একথা সবসময় মাথায় রেখে অগ্রসর

হব। এই অংশের পানির ওপর দিয়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করব। তার মাধ্যমে আমরা পুরো পৃথিবীকে আমাদের প্রতিবেশী বানাবো।

এই পানির মধ্যে আছে অফুরন্ত সম্পদ; মৎস্য সম্পদ, যা প্রতি বছর ফসল দেয়। এই পানির নীচে আছে অফুরন্ত গ্যাস। এর সবকিছুকে নিয়েই প্রতিনিয়ত আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে চালিত করতে হবে।

বর্তমান সরকার চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত ড্রাই ডক লিমিটেডকে নিউ মুরিং টার্মিনাল কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছে। তারা কাজ শুরু করা মাত্রই কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। প্রথম দুই সপ্তাহে দেখা গেছে আগের তুলনায় প্রতিদিন গড়ে ২২৫টি বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং হচ্ছে। এ বন্দরকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা গেলে তা শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতিতেই ভূমিকা রাখবে না, নেপাল, ভুটানসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বিনিময়ে তারাও উপকৃত হবে, আমরাও উপকৃত হব।

আমাদের উপকূল অঞ্চল অফুরন্ত সম্ভাবনার আধার। কুমিরা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত নানা বন্দরের কর্মচাঞ্চল্যে সমগ্র উপকূল অঞ্চলকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই পুরো অঞ্চলে অনেকগুলো শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে শুধু সমুদ্রের সান্নিধ্য এবং তার ব্যবহারের দক্ষতার কারণে। সমুদ্র, উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পদ ও পরিবেশের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমাদের বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি এবং তারা উৎসাহ সহকারে সাড়া দিয়েছেন।

গভীর সমুদ্রকে আমরা এখনো আমাদের কল্যাণের কাজে লাগাতে পারিনি। একে কেন্দ্র করে আমরা মাছ পালন, আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প গড়ে তুলতে কাজ শুরু করেছি, এতে করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আমাদের অর্থনীতি নতুন শক্তিতে বলীয়ান হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে আমরা গভীরভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য আরব আমিরাত পুনরায় ভিসা চালু করেছে। মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য প্রথমবারের মতো মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু করেছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ভিসা জটিলতা কীভাবে কমিয়ে আনা যায় এ নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আগামী পাঁচ বছরে জাপানে অন্তত ১ লক্ষ বাংলাদেশি তরুণদের পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছি। তরুণদের সেখানে পাঠানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্যান্য ব্যবস্থাও আমরা নিতে শুরু করেছি। এর পাশাপাশি, আমরা ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, সার্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মীদের পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছি।

সৌদি আরব, জর্ডান, ওমানসহ বিভিন্ন দেশে নথিপত্রের কারণে যে প্রবাসীরা ইরেগুলার হয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরকে রেগুলারাইজ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তিগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখছি যাতে আমাদের প্রবাসী ভাইবোনদের জন্য সেগুলো স্বস্তিদায়ক হয়।

দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের নাগরিকরা যে যেখানে অবস্থান করছে তারা যাতে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা পান আমরা সে বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রিয় দেশবাসী,

চলতি বছর আমাদের নানা উদ্যোগের ফলে প্রায় ৮৭ হাজার বাংলাদেশি সুষ্ঠুভাবে হজ পালন করতে পেরেছেন। হজের ব্যয়ও অন্যান্য বছরের তুলনায় আমরা কমিয়ে আনতে পেরেছি। হাজিরা যাতে নির্বিঘ্নে হজ সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য 'লাব্বাইক' নামে অ্যাপ চালু করেছি। যার মাধ্যমে ঘরে বসেই হাজিদের আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন তাদের অবস্থান প্রতি মুহূর্তে জানতে পেরেছেন।
এ বছর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতেও আমাদের হজ ব্যবস্থাপনা প্রশংসিত হয়েছে। আগামী বছরের হজ ব্যবস্থাপনা যেন আরো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য মন্ত্রণালয় এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তরুণ শিক্ষার্থীদের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের বাবা-মা ও শিক্ষকরা। আমাদের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানকে বহু কষ্টে বড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়। লেখাপড়া শেষ করে অনেক ছাত্ররা অসুস্থ হয়ে বের হয়। এর কারণ আবাসিক হলের নোংরা পরিবেশ, খাবারের নিম্ন মান তার উপর দলীয় সন্ত্রাসীদের দমনপীড়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবর্তে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের জোর করে রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রামে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রশাসন ও শিক্ষকরা সবই জানতেন, অথচ কেউ এটি থামাতে পারেননি, চেষ্টাও করেননি। কারণ শিক্ষকদের একটি বড়ো অংশ প্রমোশনের জন্য, সুবিধার জন্য দলীয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। নিপীড়কের ভূমিকায় ছিলেন।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে দলীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ আর অমানুষিক নির্যাতন চলত। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল টর্চার সেল।

অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমরা আর কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন কোনো রাজনীতি দ্বারা কলুষিত হতে দেব না যা পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করে, তরুণদের জীবন ধ্বংস করে। বাবা-মায়েদের যেন সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠিয়ে আর কখনো শঙ্কায় থাকতে না হয়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে পরামর্শক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছে, বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান কীভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সরকার কিছুদিন আগে সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান শিক্ষকের বেতনের গ্রেড এক ধাপ বাড়িয়ে দশম গ্রেড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শূন্য পদে সাড়ে ছয় হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

প্রাথমিকের পড়াশোনার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দিকেও আমরা মনোযোগ দিচ্ছি। সব স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কমপক্ষে ১০০টি স্কুলে এ বছরের মধ্যেই ই-লার্নিং চালু হবে। ঢাকা চট্টগ্রামের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা প্রযুক্তির সহায়তায় এসব স্কুলে শিক্ষকতা করে সেখানকার শিক্ষক ঘাটতি পূরণ করবেন।

যেসব এলাকায় বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে সেখানে সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসন এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক ও স্টারলিংক পরিষেবা ব্যবহার করে এ সংকট মোকাবিলা করা হচ্ছে।

স্কুলগুলোতে মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের পড়াশোনার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। স্কুলের অবকাঠামোকে নারীবান্ধব করে তুলতে স্কুল ভবন নির্মাণের সময় কমিটিতে নারী স্থপতি রাখার নিয়ম করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হলো– স্কুল ভবনের ডিজাইন থেকে শুরু করে পড়াশোনার পরিবেশ, চিন্তাভাবনায় মেয়েদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া, যাতে তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে স্বস্তিদায়ক পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ এবং আহত যোদ্ধাদের জন্যও আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত ৭৭৫টি শহিদ পরিবারকে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ও মাসিক ভাতা বাবদ ব্যাংক চেক দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁদেরও কয়েকটি আইনগত বিষয় নিষ্পত্তি সাপেক্ষে সঞ্চয়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এর পাশাপাশি আহত ১৩ হাজার ৮০০ জন জুলাইযোদ্ধাকে তিনটি ক্যাটাগরিতে নগদ টাকা ও চেক বাবদ মোট ১৫৩ কোটি ৪ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৭৮ জন অতি গুরুতর আহত জুলাইযোদ্ধাকে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক এবং রাশিয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং চিকিৎসা ব্যয় বাবদ এ পর্যন্ত প্রায় একশ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আহতদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সবকটি মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে দেশের শহরে-বন্দরে হাজারো প্রতিষ্ঠান, সড়ক, সেতু, সেনানিবাস, যুদ্ধ জাহাজ, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বৈরাচার তার নিজের এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের নামে চালু করেছিল। আমরা সব নাম পরিবর্তন করে আগের নাম বা মানানসই নাম করে দিয়েছি।

প্রিয় দেশবাসী,

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন এক অবস্থায় দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল যখন প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান অফিস-আদালত বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। আমাদের প্রথম এবং প্রাথমিক কাজ ছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণে হাত দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পুনর্গঠন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, আইন-আদালত, নির্বাচন কমিশনসহ যাবতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সচল করা এবং নাগরিকদের নিকট দায়বদ্ধ করে তোলা।

রক্তাক্ত জুলাই ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তরুণদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৬ বছর ধরে সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরোধিতা করে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে প্রতিটিতেই দলীয় সন্ত্রাসীরা অস্ত্র হাতে আন্দোলনকারীদের আক্রমণ করেছে। প্রতিটি আন্দোলনকেই দমন করার জন্য দলীয় সন্ত্রাসীরা সর্বোচ্চ আঘাত করেছে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও অংশ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথবা দাঁড়িয়ে দর্শকের ভূমিকায় থাকতে বলা হয়েছে।

একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার কাজ হাতে নিয়েছে। বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট বিচারক নিয়োগসহ যেসকল কাজ এ সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে করে যেতে পারবে সেসকল কাজের অধিকাংশই ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে, বাকী কাজ চলমান রয়েছে।

স্বৈরাচার আমলে দলীয় বাহিনীতে পরিণত হওয়া ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিয়েছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশ সদর দপ্তরে একটি 'সেল' কার্যকর করা হয়েছে, যেখানে মানবাধিকারসহ পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে সংঘটিত যে-কোনো অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ করা যায়। এই সমস্ত 'সেল' অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়েও স্থাপন করা হচ্ছে।

আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে স্বচ্ছ কাচের ঘরে। হাজতখানায় বন্দিদের মানবিক সেবা নিশ্চিত করা হবে, অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশ যেন জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ডিভাইসসহ বডি-ক্যামেরা পরিধান করেন তা নিশ্চিত করা হবে। পুলিশ যেন আর কখনোই কোনো আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেআইনি সমাবেশে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের স্বীকৃত পাঁচটি ধাপ অনুযায়ী পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১৬টি সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৪৩টি সংস্কারকাজ সমাপ্ত হওয়ার পথে।

দেওয়ানি আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ বিভিন্ন আইনগত সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি সরকার ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুমোদন করেছে। এর ফলে এখন থেকে কোনো ব্যক্তিকে আটকের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব পরিবারকে জানাতে হবে। আটককৃত ব্যক্তিকে আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে। গ্রেপ্তারকৃত

ব্যক্তি রিমান্ডের পর অসুস্থ বা আহত হলে তাকে ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা করতে হবে এবং আঘাতের কারণ নিশ্চিত হতে হবে, তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।

এক্ষেত্রে পুলিশের দায় থাকলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

এই আইনের ফলে গ্রেপ্তার ও আটক নিয়ে মানুষের হয়রানি অনেক কমে আসবে, পুলিশের জবাবদিহি বাড়বে এবং বিচারের কাজ দ্রুততর হবে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছিল কোনো ব্যক্তি থানায় জিডি করতে গেলে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। জিডি গ্রহণ করা ছাড়া থানা থেকে কোনো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দেশের সব থানায় অনলাইনে জিডি করা যাবে। এখন থানায় জিডি না নেওয়ার আর কোনো অভিযোগ থাকবে না।

গণতান্ত্রিক চর্চার অন্যতম প্রধান শর্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় মুক্ত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচাইতে বড়ো বাধা হিসেবে কাজ করেছে সরকার। অন্তর্বর্তী সরকার এসব বাধা অপসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা সমালোচনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। যে কেউ চাইলেই যে-কোনো মাধ্যমে সেটা মূলধারার গণমাধ্যম হোক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই হোক, সরকারের সমালোচনা করতে পারছেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমেও সরকারের সমালোচনা করা যাচ্ছে। নিকট অতীতে যা ছিল অকল্পনীয়।

সাংবাদিকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই প্রেস কাউন্সিল পুনর্গঠন করেছে। আপনারা জানেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ গুজব ও অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ছে। দেশকে অস্থিতিশীল করতে হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে গুজব। অপতথ্য মোকাবিলা করার জন্য সাংবাদিকদের সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্বৈরাচারী সরকার আমলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা ছিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, যা পরে সাইবার নিরাপত্তা আইন রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। আমরা এই আইনটি বাতিল করেছি। এই আইনের অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা বাতিল করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে এটি একটি বড়ো অগ্রগতি। নতুন যে আইন প্রণীত হয়েছে তাতে আগের আইনের নিবর্তনমূলক ৯টি ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে। আগের আইনের আওতায় করা ৯৫ শতাংশ মামলাই এসব ধারায়। আমরা বিশ্বাস করি, নতুন এই আইন প্রণয়নের পর সাংবাদিকদের আইনি হয়রানি বন্ধ হবে।

গত বছর মানুষের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিতে ফ্যাসিবাদী সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল, যাতে গোপনে তারা দমন-নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার সাইবার সুরক্ষা আইন সংশোধন করে নতুন অধ্যাদেশে প্রথমবারের মতো ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ (রিয়েল টাইম ইন্টারনেট ট্রাফিক) পরিবহণে ৪.০০ টেরাবাইট/সেকেন্ডের মাইলফলক অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি। বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবার মান ভালো করতে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের আহ্বানে, একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম। জুলাই অভ্যুত্থানে সৃষ্ট নতুন বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা জাগ্রত হয়েছে তাকে এগিয়ে নিতে আপনারা আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

গত ১২ মাস ধরে আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে জুলাইয়ের দাবি পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আসুন, আজ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই এই জাতিকে আমরা আর কখনো বিভক্ত হতে দেব না।

আমরা সকল নাগরিকের প্রতি মর্যাদাশীল থাকব, তিনি যেই পরিচয়েরই হোন না কেন। আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সাময়িকভাবে যদি পথভ্রষ্ট হয়েও পড়ি প্রতিবছর জুলাই আমাদেরকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হতে শক্তি জোগাবে।

জুলাই তরুণদের উছিলায় জাতির আত্ম-আবিষ্কারের মাস। ভুলভ্রান্তি শুধরে নেবার মাস। গর্তে পড়ে যাবার প্রবণতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার মাস।

জুলাই গ্রামেগঞ্জে, সরকারি-বেসরকারি স্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফসলের মাঠে, ঘরে-বাড়িতে, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো জেনে নেবার মাস।

নির্বাচন আসছে। যদি আপনি আপনার নির্বাচনি এলাকা থেকে দূরে বসবাস করেন তবে এখন থেকে নিয়মিত নির্বাচনি এলাকা পরিদর্শন করুন। যাতে সেরা ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে আপনি প্রস্তুত হতে পারেন।

যাঁদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই অতি মূল্যবান অধিকার ফিরে পেলাম, ভোটটা দেবার আগ মুহূর্তে যেন তাঁদের চেহারা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে।

ফেব্রুয়ারি বেশি দূরে নয়। নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি নিতে নিতেই ভোটের দিন এসে পড়বে। বহু বছর আমরা কেউ ভোট দিতে পারিনি। এবার আমরা সবাই ভোট দেব। কেউ বাদ যাবে না। সবাই যেন বলতে পারি নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশকে রওনা করার জন্য আমি আমার ভোটটা দিয়েছিলাম। আমার ভোটেই দেশটা সেপথে রওনা হতে পেরেছিল।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে সকল নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান, আসুন, 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রথম বড়ো পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হই।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।

ঐতিহাসিক ৫ই আগস্ট: বিজয় ও অঙ্গীকার

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান

৫ই আগস্ট– জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববানকে প্রত্যাখ্যানের ঐতিহাসিক দিন। ২০২৪ সালের এই দিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত আপামর ছাত্র-জনতাকে, যাঁদের আত্মত্যাগে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সূচনা হয়েছে।

সময়ের ব্যাপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জুলাই বিপ্লব ২০২৪ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘ এবং প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রাজপথে এই আন্দোলনটির বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও আন্দোলনের চেতনা ও তাড়না বহুদিন থেকে দেশের আপামর মানুষ ধারণ করেছেন। চূড়ান্ত পর্বে সর্বস্তরের মানুষ এতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার একটিই উদ্দেশ্য ছিল– অগণতান্ত্রিক এবং জনবিচ্ছিন্ন সরকারকে হটানো।

ইতিহাসে স্মরণীয় বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানগুলো সাধারণভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। যেমন: রুশ বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ইরানের ইসলামিক

বিপ্লব অথবা আমাদের দেশের ১৯৬৯-এর আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ও নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলন। অপরপক্ষে সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন একদল অরাজনৈতিক তরুণ শিক্ষার্থী। বাংলাদেশে এক উজ্জ্বল তরুণ প্রজন্মের অভিষেক ঘটিয়েছে এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। আন্দোলনটি প্রমাণ করেছে তরুণসমাজ অনেক সচেতন এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। জুলাই আন্দোলনে তরুণ শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি দিয়েছেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাতে সংহতি জানিয়েছেন ও অংশগ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলন কেবল কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ছিল সমতার প্রশ্নে একটি নৈতিক প্রতিবাদ। পর্যায়ক্রমে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সব ধর্মের, বর্ণের, পেশার, লিঙ্গের মানুষের অন্তর্ভুক্তি বিপ্লবটিকে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন শহর থেকে গ্রাম সারাদেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে সবার আগে দেশ। বিশ্বজুড়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে ২০২৪-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস যথার্থই বলেছেন 'বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে'।

আবু সাঈদ, শান্ত, মুগ্ধ, ফারহান ফাইয়াজের মতো জানা–অজানা বীরের রক্তের বিনিময়ে এই নতুন বাংলাদেশ। বাসার ছাদে খেলার সময় বাবার কোলে থাকা অবস্থায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ছয় বছরের রিয়া গোপ, অটো-রিকশাচালক রনি, দুধ বিক্রেতা কিশোর মোবারক– তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই নতুন বাংলাদেশে আবারও কোনো স্বৈরাচারের উত্থান ঘটুক, জাতি তা চায় না। বীরের এই রক্তস্রোত ও মায়ের অশ্রুধারা যেন কোনোভাবেই বৃথা না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের সবাইকে। জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত এবং জীবনের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মৌলিক নাগরিক অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠাই হোক– জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার।

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান: পিএইচডি, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[সূত্র: ৫ই আগস্ট ২০২৫ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসের ক্রোড়পত্র]

জুলাই চেতনার বহ্নিশিখা

হাসান হাফিজ

চব্বিশ গণ-অভ্যুত্থান অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে যত গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে- এর চারিত্র্য, গুণগত প্রকৃতি অন্যসব আন্দোলন থেকে অনেকটাই আলাদা। জুলাই এক নবচেতনার নাম। জ্বলজ্বলে শিখা। বৈষম্য, অনাচার, দুঃশাসন, দুষ্কৃতি, দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ইস্পাতকঠিন ঐক্য, দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় ভাস্বর এই জুলাই চেতনা। এই বহ্নিশিখা অবশ্যই কালক্রমে দূর করবে প্রতিক্রিয়াশীলতা, সমস্ত অন্ধকার, কূপমণ্ডুকতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা। জুলাই চেতনা এক প্রদীপ্ত মশাল, অসামান্য এক দিকনির্দেশনা। এমন প্রত্যাশা করবার মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, নিঃসন্দেহে আমরা সে কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। তারুণ্য যে সবসময় ন্যায় ও প্রগতির পক্ষে, দৃঢ়, আপোশহীন পরিবেশের গণ-অভ্যুত্থান সেই ঐতিহ্যের স্বীকৃতি ও নবরূপায়ণ দিয়েছে।

৫ই আগস্ট মূলত প্রাথমিক বিজয়। আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ জাতির সামনে অপেক্ষমাণ। সেটা কী? সর্বপ্লাবী ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে সংহত করা, টেকসই রূপদান এর সুফল প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার, তার সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নই অন্যতম বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ। দেশ এখন টালমাটাল পদক্ষেপে গণতন্ত্র উত্তরণের কঠিন অভিযাত্রায়, সেই অভিযানে সর্বস্তরের প্রায় ১৮ কোটি মানুষ, দেশবাসী প্রত্যেকেই শরিক। আমাদের প্রত্যাশা, সম্মিলিত ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমরা সেই চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব।

মনস্বী চিন্তক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্প্রতি তাঁর এক রচনায় চব্বিশের সর্বপ্লাবী ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের চারিত্র্য বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর লেখার শিরোনাম 'বৈষম্যবিরোধী আওয়াজটা সর্বজনীন'। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখাটি বিশেষ গুরুত্ববহ, তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। তিনি লিখেছেন, এবারকার গণ-অভ্যুত্থান আগের অভ্যুত্থানগুলোর চেয়ে বেশ কিছুটা ভিন্ন। অভ্যুত্থান ছাত্ররা শুরু করলেও এর যে শক্তি ও বেগ, সেটা সৃষ্টি হয়েছে বিপুলসংখ্যক জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। উনসত্তরেও ছাত্ররাই শুরু করেছিল, অংশ নিয়েছিলেন কর্মজীবীরা ও মেহনতিরা। কিন্তু অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তখন এমন ব্যাপকতা ও এতটা স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায়নি। এত রক্তও ঝরেনি। উনসত্তরের অভ্যুত্থান শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু থামিয়ে দিয়েছে বুর্জোয়ারা; তাদের সামাজিক বিপ্লবের আতঙ্কে পেয়েছিল। এবারের অভ্যুত্থানের জমিনটাও কিন্তু হঠাৎ করেই তৈরি হয় নি। একদিকে ছিল মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কাজ, অন্যদিকে দুইয়ের বিপরীতে ফ্যাসিবাদী সরকারের অভাবনীয় সন্ত্রাস। জমিন তৈরি হচ্ছিল দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, কিন্তু তার শাসন ছিল পুরোদস্তুর পিতৃতান্ত্রিক; এবং তিনি দমন পীড়নের যে নজির রেখে গেলেন, সেই কাজ স্বাধীন বাংলাদেশের অন্য কোনো শাসক করতে পারেননি। ওই কাজ তিনি আরও করতেন, সশস্ত্রবাহিনী যদি অসম্মত না হতো।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৫ বছর নয়, ১০ বছরের বেশি তার পিতৃতান্ত্রিক শাসন কায়েম রাখতে পারেননি। জনতার অভ্যুত্থানে ভূপতিত হয়েছেন। তিনিও চেয়েছিলেন সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যবহার করে, রক্তপাত ঘটিয়ে টিকে যেতে। সশস্ত্রবাহিনী সম্মত হয়নি বলেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। তবে তিনি পালাতে পারেননি, সদ্যপতিত প্রধানমন্ত্রী যেমনটা পেরেছেন। পেরেছেন

বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। বলতে হবে, পালাতে বাধ্য হয়েছেন। শেষ মুহূর্তেও তার ইচ্ছা ছিল, সশস্ত্রবাহিনী আরও বেশি বল প্রয়োগ করুক। কিন্তু বাহিনীর প্রধানরা সম্মত হননি। যে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য তাঁরা প্রতিপালিত, তাঁদের রক্তেই মাতৃভূমিকে সয়লাব করে দেবেন– এমন কাজে সায় দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ চব্বিশের অভ্যুত্থানের ব্যাপকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা দুটিই ছিল অনেক বিস্তৃত ও গভীর; আর বৈষম্যবিরোধিতার যে আওয়াজ উঠেছিল, সেটা ছিল প্রায় সর্বজনীন। শিক্ষার্থীরা চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগের বৈষম্য মানবে না বলে ফুঁসে উঠেছিল, কিন্তু তাদের অভিভাবকদেরও বেশির ভাগের বুকের ভেতর ছিল ওই একই আওয়াজ; কারণ তারাও নানাভাবে এবং বহু রকমের বৈষম্যের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

সমাবেশে ও মিছিলে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বৈষম্য কী জিনিস সেটা মর্মে মর্মে জানেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের 'সুদৃশ্য' অট্টালিকাটি যে দাঁড়িয়ে আছে, তার গোড়ায় রয়েছে বৈষম্য। যাদের শ্রমে এর নির্মাণ, তারা এই অট্টালিকার আরামদায়ক অভ্যন্তরে ঠাঁই পান না, তারা থাকেন নির্মাণের ফলে তৈরি খানাখন্দে। অসন্তুষ্ট ও অশ্রুসিক্ত বঞ্চিতদের কাঁধের ওপর ভর করেই গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা টিকে আছে, নীচের মানুষ নড়েচড়ে উঠলেই সর্বনাশের শঙ্কা। নীচের মানুষদের তাই দাবিয়ে রাখা হয়, ভয় দেখানো হয় যতভাবে পারা যায়।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নির্মোহ বিশ্লেষণে আমরা পাই এবারের গণজাগরণের অনন্যতার বিশ্বস্ত চিত্র। তারুণ্যের অহংকারে উদ্দীপিত এই অভ্যুত্থানের শ্রেণিচরিত্র, পটভূমি, পরিণতি তাঁর তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ পর্যবেক্ষণে এক প্রকার সুস্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে। একই নিবন্ধে আমরা জানতে পারছি সেই সময়ের দাবি, ভিত্তি। রাষ্ট্র যে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, ক্ষমতা তা কুক্ষিগত করেছিল ফ্যাসিস্ট অপশক্তি, সেসব তিনি শনাক্ত করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, "যে-কোনো অভ্যুত্থানেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মানুষের ভয় ভেঙে যাওয়া। চব্বিশেও সেটা ঘটেছে। ভয় ভেঙেছে একত্র হতে পারার কারণে। ভয় ভেঙেছে তারুণ্যের দরুন। তারুণ্যের অবিস্মরণীয় প্রতীক, আবারও স্মরণ করতে হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের দুই হাত ছড়িয়ে পুলিশের উদ্যত অস্ত্রের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। ওই ভাস্কর্যটি কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না, কারণ ওটি তৈরি হয়েছে অভঙ্গুর উপাদানে এবং স্থান করে নিয়েছে আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাসের পাতায়।

রাষ্ট্র তারুণ্যকে ভয় করে, সমাজও যে তারুণ্যকে পছন্দ করে, তা নয়। তারুণ্যকে দমিত করার সব ব্যবস্থা রাষ্ট্র তার নিজের অভ্যাসবশতই করে থাকে, সমাজও তাতে যোগ দেয়। একটা ব্যাপার ছোটো মনে হতে পারে কিন্তু মোটেই ছোটো নয়; সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না দেওয়া। সেখানে দুঃসহ একাধিপত্য চলেছে সরকারি দলের ছাত্রদের। গণতন্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষাটা তরুণরা পেতে পারে শিক্ষায়তনিক ছাত্রসংসদ থেকেই। ছাত্রসংসদ আগে ছিল; এমনকি সামরিক শাসনের সময়েও ছাত্রসংসদকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯৯১ সালে, স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর থেকে 'গণতান্ত্রিক' সরকাররা যখন ক্ষমতায় আসা-যাওয়া শুরু করল, ঠিক তখন থেকেই ছাত্রসংসদ লুপ্ত হয়ে গেল; চলল সরকারদলীয় ছাত্র নামধারীদের স্বৈরাচার। এই যে 'অগ্রগতি', এর তাৎপর্যটা কী? তাৎপর্য হলো এটাই যে, এরই মধ্যে রাষ্ট্র আরও বেশি

স্বৈরতান্ত্রিক হয়েছে, যাত্রা করেছে ফ্যাসিবাদের অভিমুখে, যার আপাত-চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল পতনপূর্বে শেখ হাসিনার জমিদারতন্ত্রে। তরুণরা গুণ্ডা-বদমাশ হোক, মাদকের পাল্লায় পড়ুক, তারুণ্য গোল্লায় যাক, কিশোর গ্যাং গঠিত হোক– কোনো কিছুতেই আপত্তি তো নেই-ই, বরং সাগ্রহ অনুমতি আছে; কারণ তরুণ যত তার তারুণ্য খোয়াবে, শাসকদের গদি ততই পোক্ত হবে। সোজা হিসাব!

পিতা চলে গেলেই পিতৃতান্ত্রিকতা যে বিদায় হয়, তা নয়। পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান ঘটানোর জন্য একটি সামাজিক বিপ্লব আবশ্যক। আমাদের দেশে সেই বিপ্লব আজও ঘটেনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও যে সহসা ঘটবে, এমন আশা নেই। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর নিশ্চয়তাপ্রাপ্তি দূরের সুখস্বপ্ন বটে। আর সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেহেতু ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটেনি, তাই বৈষম্য উৎপাদনের প্রকৃত ক্ষেত্রটি অক্ষুণ্নই রয়ে গেছে। আর স্বাধীনতা? সেটা তো আমরা বার বার পাচ্ছি। সাতচল্লিশে পেলাম, পেলাম একাত্তরে, বলা হচ্ছে চব্বিশের জুলাইতেও পেয়েছি। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছি কি? আবারও স্মরণ করা যাক যে প্রকৃত স্বাধীনতার নাম হচ্ছে মুক্তি। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই মুক্তি আশপাশে কোথাও নেই। বৈষম্যের রাজত্বই সর্বত্রব্যাপ্ত। ওই বৈষম্যের রক্ষক হচ্ছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই নিকৃষ্টতম রূপ।"

দ্রোহের গ্রাফিতি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ইতোমধ্যেই অনেক প্রামাণ্যচিত্র, গান, কবিতা, গল্প, ছড়া, নিবন্ধ, প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। সেই ধারা চলমান। বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এরই মধ্যে। চব্বিশের সেই মহতী অর্জনকে ধরে রাখার জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এসব প্রয়াস। প্রকাশনা সংস্থা অনন্যা থেকে বের হয়েছে জিএম রাজিব হোসেনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নাম 'দ্রোহের গ্রাফিতি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান'। এ বইয়ের ভূমিকায় রয়েছে গ্রাফিতি অঙ্কনের পটভূমি, ইতিহাস।

সেই ভূমিকার খানিকটা উদ্ধৃতি এখানে–

"... ১৯শে জুলাই ২০২৪ শুক্রবার 'কমপ্লিট শাটডাউন'কে কেন্দ্র করে বিশেষ করে জুম্মার নামাজের পর সারাদেশে ছাত্র-জনতার সঙ্গে সরকার সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। রাজধানী ঢাকাতে এদিন তীব্র সহিংসতা হয়। শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। শুধু ঢাকাতেই প্রায় ৫০ জনের মতো মানুষ নিহত হয়। সারাদেশে আহত হয় হাজার হাজার মানুষ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ছাত্রহত্যার দায় স্বীকার করে প্রকাশ্যে শেখ হাসিনার ক্ষমা প্রার্থনাসহ নয় দফা দাবি ঘোষণা করেন। তারা হামলায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ও বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেন। একইসঙ্গে নয় দফা না মানলে 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলমান রাখারও ঘোষণা দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে রাতে কারফিউ জারি করা হয় এবং

সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কারফিউ উপেক্ষা করে ২০শে জুলাই শনিবারও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভে নামে সাধারণ ছাত্র-জনতা। আন্দোলন ঠেকাতে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। সব স্থানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও নিরাপত্তা বাহিনীর পাশে থেকে আন্দোলন দমনে সক্রিয় থাকে। শনিবারও বহু মানুষ হতাহত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তুলে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। এছাড়া তিনজন সমন্বয়ক তিন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আট দফা দাবি পেশ করেন। সমন্বয়কদের আরেকটি অংশ নয় দফা দাবি পেশ করেন।

২১শে জুলাই সরকারি চাকরিতে মাত্র ৭ শতাংশ কোটা রেখে আদালত রায় প্রদান করে। তবে এদিনও দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ-বিজিবির গুলিতে ৩১ জন নিহত হয়। প্রতিদিনই নিহতের তালিকা বাড়তে থাকে। হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ চলতে থাকে। তবে কোটা সংস্কার করে আদালতের রায়ের পর আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে পতিত আওয়ামী লীগ সরকার কয়েক হাজার মামলা দিয়ে সারাদেশে 'ব্লক রেইড' শুরু করে। এলাকা ভাগ করে চলে এ ব্লক রেইড। চলতে থাকে গণগ্রেপ্তার। হাসপাতাল থেকেও গোয়েন্দারা চিকিৎসারত ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যায়। মাত্র

কয়েক দিনে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে ২৭শে জুলাই অনলাইনে সমন্বয়কদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা থেকে পরদিন ২৮শে জুলাই অনলাইন ও অফলাইনে গ্রাফিতি অঙ্কন ও দেয়াল লিখনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকার সমর্থকদের সহিংস হুমকির মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সীমিত আকারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচণ্ড দমনপীড়নে বিক্ষুব্ধ মানুষ গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ উগরে দেয়। প্রকাশ করেন দীর্ঘদিন মনের মধ্যে পুষে রাখা প্রচণ্ড ঘৃণা। এক একটি গ্রাফিতি, এক একটি দেয়াল লিখন যেন প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ। এক একটি গ্রাফিতি যেন দেশের কোটি কোটি মানুষের মনের অভিব্যক্তি। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঘটনায় অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়া আন্দোলন আবার প্রাণ ফিরে পায়। ২৯শে জুলাই ঢাকার আটটি স্থানে পুনরায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। এদিন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতেও হামলা ও বাধা দেওয়া হয়।

গত কয়েকদিন মানুষ হত্যার বিচার চেয়ে ৩০শে জুলাই মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রোফাইল পিকচার লাল করেন বহু মানুষ। এদিন নতুন কর্মসূচি 'মার্চ ফর জাস্টিস' ঘোষণা করা হয়। ৩১শে জুলাই বুধবার দেশের বিভিন্ন আদালত চত্বর, ক্যাম্পাস ও রাজপথে 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালিত হয়। ১লা আগস্ট পালিত হয় 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস' কর্মসূচি। এর অংশ হিসেবে আন্দোলনের ভয়ংকর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ, শহিদ ও আহতদের নিয়ে পরিবার ও সহপাঠীদের স্মৃতিচারণ, নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে গ্রাফিতি অঙ্কন, দেয়াল লিখন, ফেস্টুন তৈরি করা হয়।

২রা আগস্ট ৯ দফা দাবিতে সারাদেশে গণমিছিল করে ছাত্র-জনতা। এ সময় নতুন করে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে ফের তিনজন শহিদ হলে পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে নয় দফা না মেনে হত্যাকাণ্ড ও গণগ্রেপ্তার অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনারে কয়েক লক্ষ মানুষ সমাবেশ করেন। ৩রা আগস্ট সরকারের আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কঠোর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ইতোমধ্যে দেশের কোটি কোটি মানুষ এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। এটা তখন সত্যিকার অর্থেই আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এ প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফার ঘোষণা দেন। তখন শেখ হাসিনা রাজপথে ছাত্র-জনতাকে প্রতিহত করার কড়া নির্দেশ দেয়। ৪ঠা আগস্ট রাজধানীসহ সারাদেশে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ভয়াবহ হামলা চালায় আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মানুষের মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে সারাদেশে ১৩০ জন নিহত হয়। মানুষ এদিন সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এদিন ৫ই আগস্ট ঢাকামুখী লং মার্চের ঘোষণা দেওয়া হয়। লং মার্চকে কেন্দ্র করে ৫ই আগস্ট সকাল থেকেই মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এদিনও গুলি করে শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়। কিন্তু কোনোকিছুতেই মুক্তিকামী মানুষের অগ্রযাত্রাকে সরকারি বাহিনী রুখতে পারেনি। অবশেষে জনরোষের কাছে শেখ হাসিনা পরাজিত হয়। এদিন দুপুরের দিকে ক্ষমতা ছেড়ে সে ভারতে পালিয়ে যায়। কিন্তু এর আগে শেষ পর্যন্ত তার ক্ষমতায় থাকার অদম্য বাসনার বলি হন হাজার হাজার মানুষ। ২০শে সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য সচিব এক ফেসবুক লাইভে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১ হাজার ৪২৩ জন নিহত ও ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হওয়ার কথা জানান।

জুলাই-আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর সরকারি বাহিনী ও তাদের সমর্থকদের সহিংসতা, বর্বর হামলা ও সীমাহীন নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে গ্রাফিতি অঙ্কন ও দেয়াল লিখন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের আগ পর্যন্ত গ্রাফিতি অঙ্কনের মতো নিরীহ এ কর্মসূচিও প্রকাশ্যে চালাতে পারেননি এদেশের মানুষ। নির্যাতনের ভয়ে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের দেয়ালে চলত এ গ্রাফিতি অঙ্কন। এগুলোর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের দ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষোভ ঠিকরে বেরিয়েছে। তুমুল গণ-আন্দোলনের মধ্যে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও ছাত্র-জনতার ক্ষোভ কোনোক্রমেই প্রশমিত হচ্ছিল না। তারা কোনোভাবেই দেশের মানুষের ওপর চালানো এত নির্মম নির্যাতন মেনে নিতে পারছিলেন না। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে হতাহত মানুষকে ভুলতে পারছিলেন না। তাই ৫ই আগস্টের পরবর্তী কয়েকদিনও আওয়ামী লীগের গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আবারো রংতুলি হাতে তুলে নিয়েছিলেন এ দেশের তরুণ তুর্কিরা। তাদের রং তুলির আঁচড়ে রঙিন হয়েছে দেয়ালের পর দেয়াল। আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন ন্যারেটিভ এতে প্রকাশিত হয়। তাদের এক একটি গ্রাফিতি দেশের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়।

একটি সময় এসব গ্রাফিতি, দেয়াল লিখন হয়ত থাকবে না। সময়ের বিবর্তনে হয়ত একদিন এগুলো মুছে যাবে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সময়টিকে ধারণ করে রাখাই এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। সারাদেশের বিভিন্ন দেয়ালে লক্ষ লক্ষ গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখনের মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু স্থান পেয়েছে। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শকে ধারণ ও বিস্তৃতি এই গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য।"

হাসান হাফিজ: সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

সুশাসন সুশাসনের স্বার্থেই

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি– এসব শব্দ প্রায়শ ব্যবহৃত হয় গণতন্ত্রের নান্দিপাঠে, নির্বাচনি ইশতেহারে, কোনো কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে বেশি বেশি উচ্চারিত হয় আঁতেল আমলা আর ব্যবহারজীবীদের মুখে। সুশাসনের অভাবহেতু উদ্বেগ-উচ্চারণেই গড়ে ওঠে হরেক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থা এমনকি একে কেন্দ্র করে বড়ো বড়ো প্রকল্পে ব্যবহারজীবীরা আয়-রোজগারও করছেন। কিন্তু আসলে সর্বত্র সুশাসন কি হালে পানি পাচ্ছে? এমনকি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পরিস্থিতি উন্নতির কোন পর্যায়ে তা নিয়েও নিয়ত চলে মহাজন বাক্য ছোড়াছোড়ি। সেটা খতিয়ে দেখাও সুশাসনের স্বার্থেই জরুরি। খোদ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিরই স্ব-মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রয়োজন এজন্য যে, সুশাসন সামষ্টিক উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত এবং সুশাসন সুনিশ্চিত না হলে। সম্পদ অর্জনের নৈতিক ভিত্তি বা প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হলে বণ্টন ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠু হয় না। বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান এ আশংকা ও উদ্বেগের হেতুতে পরিণত হয়েছে। সমাজে বণ্টনবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে সুশাসন প্রেরণা ও প্রভাবক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্যও জরুরি। যেমন– আজকাল এক দেশ বা অর্থনীতির প্রচুর অর্থ বিদেশে কিংবা অন্য অর্থনীতিতে দেদারসে পাচার হয়ে থাকে। বিনা বিনিয়োগে বা বিনাপরিশ্রমে প্রকৃত পণ্য ও সেবা উৎপাদন ব্যতিরেকে অর্থ অর্জিত হলে অবৈধভাবে অর্জিত সেই অর্থ পাচার হবেই। অর্থ বৈধ পন্থায় উপার্জিত না হলে সেই অর্থের মালিকানার প্রতি দায়-দায়িত্ববোধও গড়ে ওঠে না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাই পরিচালনার (good governace) অন্যতম অনুষঙ্গ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা চাইলে চিন্তাভাবনায়, নীতি পরিকল্পনায় ও কর্মে সবাইকে স্বচ্ছ এবং সর্বত্র জবাবদিহির পরিবেশ নিশ্চিত হতে হবে। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল সকল গণপ্রজাতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণা। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের জন্য জনগণের দ্বারাই জনগণের সরকার নির্বাচিত হবে এমনটি নিয়ম। রাষ্ট্রে যে-কোনো ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সাধনার সফলতার উপর নির্ভর করবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শক্তিশালী অবস্থান ও বিকাশ।

আরেকটি বিষয়, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সৌভাগ্য তথা স্বাধীনতার সুফল সকলের মধ্যে সুষম বণ্টন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সুনিশ্চিত সুশাসন এবং জবাবদিহির সুযোগ ব্যতীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা গড়ে উঠে না। গণতান্ত্রিক মূলবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অযুত ত্যাগ স্বীকারের প্রকৃত প্রতিফল অর্জন সম্ভব হয় না শক্তিশালীকরণেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, সমাজে একপক্ষ বা কতিপয় কেউ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মধ্যে থাকলে, আর অধিকাংশ অন্যজন কারো কাছে কোনো জবাবদিহির মধ্যে না থাকলে অর্থাৎ একই যাত্রায় ভিন্ন আচরণে নিষ্ঠ হলে পারস্পরিক অভিযোগের নাট্যশালায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হয় না, জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে না। সমতা বিধানের জন্য, সকলের প্রতি সমান আচরণের (যা গণতন্ত্রের মর্মবাণী) জন্যও স্বচ্ছতা তথা আস্থার পরিবেশ প্রয়োজন।

সুশাসনের অবর্তমানে জবাবদিহিবিহীন পরিবেশে, আয়ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতার অবয়বের (cause) অন্যতম প্রতিফল (effect) হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি শুধু ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ যে দুর্নীতি করে তাকে ন্যায়নীতিহীনতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে তা নয়, তার দ্বারা সমাজকে নেতৃত্বদান বা যে-কোনো ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত অবস্থান গ্রহণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়। সর্বত্র তাকে

দূর্বল করে দেয়। দুর্নীতিবাজ নেতৃত্বের জন্য বা কারণে সমাজে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়। নেতৃত্বের এই অধোগতির প্রেক্ষাপটই প্রত্যক্ষভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাবজনিত পরিবেশ নির্মাণ করে। নেতৃত্বের কার্যকলাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে সমাজে সংসারে সে নেতৃত্বের অধীনে আস্থার সংকট তৈরি হয়। এটি পরস্পর প্রযুক্ত সমস্যা। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির অবসরে আত্মঘাতি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেমন– যে-কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ। যেমন– স্বেচ্ছাচারিতায়, নানান অনিয়ম ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে শিক্ষায়তনে শিক্ষক, সুশীল সেবক, হাসপাতালে চিকিৎসক কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কর্মীবাহিনী নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার সবই প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ বিনিময় ও নানান অনিয়মের কারণে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে ভালো ও যোগ্য সুশীল সেবক, চিকিৎসক, শিক্ষক আইন রক্ষক নিয়োজিত হতে পারে না। সুশীল সেবক, চিকিৎসক অমেধাবী ও অযোগ্য শিক্ষক ও আইন রক্ষকের কাছ থেকে গুণগতমান সম্পন্ন প্রশাসনিক সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা বা তালিম বা অনুসরণীয় আদর্শ লাভ সম্ভব হয় না। অবৈধ লেনদেনে নিয়োগপ্রাপ্ত অযোগ্য সেবক, চিকিৎসক কিংবা শিক্ষকের কাছে কার্যকর সেবা, চিকিৎসা ও শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগ বাণিজ্য চলে সেখানে মেধাবী ও উপযুক্ত প্রার্থীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। তাদের বিপরীতে নিয়োগ পায় অদক্ষ-অযোগ্য লোক। এটা একটি দিক। আরেকটি দিক, কেউ বিশেষ গোষ্ঠীর সমর্থক হয়ে এবং অবৈধভাবে অর্থ দিয়ে নিয়োগ পেলে সে প্রথমে চাইবে গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে সেবা চিকিৎসা ও শিক্ষার পরিবেশকে বিপন্ন করে ঐ অর্থ তুলতে। সেক্ষেত্রে সে প্রয়োজন হলে যে-কোনোভাবে (কর্তব্য দায়িত্বহীন হয়ে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করা থেকে শুরু করে নানা ফাঁকিজুকি ও পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করে) ইচ্ছা করে নীতি নৈতিকতা ভুলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ উঠিয়ে নেবে। তখন সে তার চাকরি বা দায়িত্বশীলতার দিকে নজর দেবে না। কোনো পদপ্রার্থী কর্তৃক কোনো সংস্থা ও সংগঠনে স্রেফ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সময় কিংবা কোনো সংস্থায় নিয়োগ পাওয়ার সময় যে অর্থব্যয় করে তা নি:সন্দেহে একটি মারাত্মক মন্দ বিনিয়োগ। এতে সমাজ দুই দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, একজন ভালো যোগ্য প্রার্থীর স্থলে একজন দুর্নীতিবাজ অদক্ষের অবস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয়ত, সে চিকিৎসা কিংবা লেখাপড়ার পরিবেশ বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে এমনভাবে কলুষিত করতে পারে তাতে যুগ যুগ ধরে দুষ্টক্ষতেরই সৃষ্টি হয়।

আজকাল পাবলিক ও প্রাইভেটসহ সব ক্ষেত্রেই যে-কোনো সেবা, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা ও দেদারসে চলে অর্থ লেনদেনের ছড়াছড়ি। অবস্থা এমন অর্থ খরচ ব্যতীত বিনামূল্যে প্রাপ্য কোনো সাধারণ সেবা পর্যন্ত মিলবে না। উপরির বিনিময়ে যে-কোনো ন্যায্য সেবাও বিক্রি করা হয়, সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে আত্মসাৎ অপচয়, অপব্যয় লাগামহীন করে তুলতে পারে। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে গণপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের সময় ভোটারদেরকে বলছেন তাদেরকে 'সমাজ সেবার সুযোগ' দিতে। কিন্তু সেখানে যদি দেখা যায় সমাজ সেবার সুযোগ পাওয়ার জন্য ভালো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তাহলে কথিত 'সমাজ সেবা' তো বিনিয়োগ ব্যবসায় পরিণত হবে। কেননা, নির্বাচিত হয়ে কোনো পদে গেলে আলোচ্য ব্যক্তি নিজের বিনিয়োজিত অর্থটা আগে উঠিয়ে নিতে চাইবেন। সুতরাং নির্বাচন পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সমাজ সেবার সুযোগ কিনতে হলে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সেক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। তহবিল তসরূপ, আত্মসাৎ, সম্পদের ও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহি অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

স্বচ্ছতা-জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হলো, যার যা কাজ তাকে সেভাবে করতে দেওয়া বা ক্ষমতা দেওয়া। যেমন– স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকার পরিচালনা আয়ব্যয় ব্যবস্থাপনার ভার স্থানীয় সরকারের হতে দেওয়া হলে সে সরকার হবে প্রকৃত প্রস্তাবে তার নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে জবাবদিহিমূলক স্থানীয় পর্যায়ের সরকার। স্থানীয় সরকারই সেখানকার ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করবেন। স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য সেখান থেকে তারা যে কর নেবেন তা থেকেই সেখানে সেবামূলক কাজ নিশ্চিত করবেন যে প্রতিশ্রুতি তারা দেবেন তা তারাই পূরণ করবেন। তাহলেই সেটা অর্থবহ ও কার্যকর হবে। স্থানীয় সরকারকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ থাকতে হবে। তবেই স্থানীয় সরকার শব্দটির যথার্থতা ফুটে উঠবে।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সাবেক সচিব, সাবেক চেয়ারম্যান এনবিআর

বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত

ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ৩রা জুলাই বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে 'স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি অফ এমওইএফসিসি, ডিওই অ্যান্ড বিএফডি ফর ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স'–শীর্ষক প্রকল্পে প্রায় ৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ড. এ, কে, এম শাহাবুদ্দিন এবং সুইডেন সরকারের পক্ষে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড হেড অব ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন Maria Stridsman চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকার তদারকি বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট তহবিল গঠনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সুইডেন দূতাবাস ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: অর্ণব দাশ

বর্ষপূর্তিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

ড. মো. মনিরুজ্জামান

২০২৪ সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। মাত্র ৩৬ দিনের (১লা জুলাই-৫ই আগস্ট) আন্দোলনে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হয়েছিল। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ১৫ বছরের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, গুম, খুন, দুঃশাসন ও ভোটাধিকার হরণসহ নানাপ্রকার নিপীড়নের যে স্টিম রোলার চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের জনগণ কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এ আন্দোলনটি প্রথমে কোটা সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পরবর্তীতে তা ধাপে ধাপে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ১৬ই জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যায়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং সারা দেশব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পলায়নের মধ্যে দিয়ে তার দুঃশাসনের অবসান ঘটে।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে আপামর জনতার এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। সরকারের দীর্ঘদিনের বিচারহীনতা, দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল। যে কারণে গণ-আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের ৩ দিন পর ৮ই আগস্ট শান্তিতে নোবেলবিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত হয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আন্তর্জাতিক মহল এবং সে সময়কার অভ্যন্তরীণ গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে ছাড়া মোটেও সম্ভব ছিল না। এ সরকারের নিকট মানুষের প্রত্যাশা ছিল অপরিসীম। কারণ পূর্ববর্তী সরকারের ভয়ের সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের উন্নয়ন, সুশাসন, স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, তা প্রশংসনীয়। এতদ্সত্ত্বেও কিছুক্ষেত্রে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হতাশাজনক।

বর্ষপূতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রমের বিচার-বিশ্লেষণ করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যাশা আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন এবং গণতন্ত্রে উত্তোরণের পথ উন্মুক্ত। বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনিব্যবস্থা, দুর্নীতিদমন কমিশন এবং পুলিশের কিছু সংস্কার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও কিছুটা ফিরে এসেছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রভু নয় বন্ধু রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের সাথে নতুন করে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ও জনগণের প্রত্যাশা এখনো পূর্ণরূপ লাভ করেনি। মোটাদাগে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল একটি মুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৫ই আগস্ট ২০২৫ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন— পিআইডি

তোলা। অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা এবং কৌশলগত ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিজ নিজ দলের অবস্থান ও সুবিধা আদায়ের অসম প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বের লড়াই এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করায় সমাজে এক মারাত্মক বিভাজন তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে জাতীয় অগ্রযাত্রাকে যে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করবে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিগত সরকারের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হলো– প্রশাসনিক, গোয়েন্দা এবং সামরিক বাহিনীগুলোতে হাসিনা সরকারের অনুগত কিছু লোক আজও সক্রিয়। এদের অনেকেই অত্যন্ত গোপনে নতুন সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে আবারও অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের অনুগত শক্তিকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা।

এরূপ অবস্থায় যদি সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো, বুদ্ধিজীবী মহল এবং সুশীল সমাজ একত্রিত না হয় এবং তাদের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত না হয় তাহলে আমরা আবারও সেই পুরানো ধাঁচের ফ্যাসিবাদী সরকার এবং বিদেশি শক্তির আধিপত্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবো। তাই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাস্তবায়নের জন্য এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যে কারণে বিগত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল এবং ছাত্রসংগঠনের মধ্যে কীভাবে ঐক্য গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কেবল একটি ইতিহাস নয়, এটি দেশের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এ অভ্যুত্থান আমাদের শিখিয়েছে যে, ছাত্রসমাজ যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে দেশের ইতিহাস নতুন করে লেখা সম্ভব। যদিও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বেড়াজালে আবদ্ধ দেশ, তথাপি সঠিক দিক নির্দেশনায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ পারে একটি সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল জাতি উপহার দিতে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছাত্রদের নেতৃত্বে সংগঠিত হলেও এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল। এ ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্য, সাহস ও চেতনার কণ্ঠ কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। এটি শুধু অতীতের নয়, ভবিষ্যতের জন্যও বার্তা বয়ে আনবে। তাই আগামীতে যে রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হোক না কেনো তাকে এই চেতনাই বুকে ধারণ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। জুলাইয়ের চেতনার হোক বাস্তবায়ন। হোক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার বিজয়।

ড. মো. মনিরুজ্জামান: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, mzamanbrur71@gmail.com

জুলাই অভ্যুত্থানে প্রবাসী ও বিদেশিদের ভূমিকা

মো. গোলাম ফারুক মজনু

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই গণ-আন্দোলনে শুধু দেশের সাধারণ মানুষ নয়, বিদেশি নাগরিক এবং বাংলাদেশে ও বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত তথ্য প্রচার, রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে তাদের অবদান লক্ষণীয়। এই নিবন্ধে আমি সেইসব দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় বিদেশে বসবাসরত অনেক স্বৈরাচারবিরোধী নাগরিক এবং মানবাধিকার কর্মীরা বাংলাদেশে ঘটমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে তথ্য প্রচার করেছেন। তারা বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার পত্রিকার মাধ্যমে তথ্য পাঠিয়ে অভ্যুত্থানের খবর বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রচারের ফলে বাংলাদেশের প্রতি বৈশ্বিক নজরদারি বেড়েছে এবং বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

বিদেশি কূটনৈতিক মহল, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা বাংলাদেশের সরকারের কাছে মানবাধিকার রক্ষা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন। এই কূটনৈতিক চাপের ফলে সরকারের আচরণ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, যদিও পরিপূর্ণ প্রগতিশীলতা আসেনি। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই মনোযোগ ও চাপ অভ্যুত্থানের সাফল্যে অবদান রেখেছে।

দেশে বসবাসরত বিদেশি নাগরিক ও বিদেশি সংস্থা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। পাশাপাশি তারা সাধারণ জনগণকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দুর্বল ও বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোকে সচেতন করে তুলতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে কেউ অশান্তি বা সহিংসতায় জড়িয়ে না পড়ে। এটি অভ্যুত্থানকে শান্তিপূর্ণ ও সফল করতে সহায়তা করেছে।

এ সময় দেশের বাইরে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকেও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেখা গেছে। তবে কিছু কিছু প্রবাসী বিদেশ থেকে বিভিন্ন অপপ্রচার, ভুল তথ্য এবং বিদ্বেষমূলক এভিডেন্স (প্রমাণ) পাঠানোর চেষ্টা করেছে, যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রমে জড়িয়ে না পড়ার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেশের মঙ্গল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সঠিক তথ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানে প্রবাসীদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিদেশি নাগরিকরা তাদের নিজ দেশে বাংলাদেশে চলমান গণ-অভ্যুত্থানের খবর এবং স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে তথ্য প্রচার করেছেন। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে

বিশ্ববাসীর কাছে এই প্রতিবাদকে তুলে ধরার মাধ্যমে ব্যাপক সমর্থন ও সচেতনতা তৈরি করেছেন। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক দপ্তরে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে গণ-অভ্যুত্থানের বাস্তবতা তুলে ধরে চাপ সৃষ্টি করেছেন। বৈদেশিক কূটনীতিক ও সরকারগুলোর কাছে বাংলাদেশের স্বৈরাচার শাসনের অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা অভ্যুত্থানের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পরিবার ও আহতদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন। প্রতিবাদের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণে অর্থায়ন করেছেন। বিদেশে বসবাসরত প্রবাসীদের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে তথ্য ও সতর্কতা প্রচার করে তাদেরকে রেমিট্যান্স (বিদেশ থেকে দেশে অর্থ প্রেরণ) পাঠানো থেকে বিরত রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা ও অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করেছেন যাতে তারা কোনো ঝুঁকিতে না পড়ে।

বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠন ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে সমবেত হয়ে গণ-অভ্যুত্থানকে শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ও সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ স্ট্রিমিং, ভিডিও, ব্লগ ও পোস্টের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে সমর্থন এবং স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার করেছেন। ডিজিটাল প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

ইন্টারনেট বন্ধের প্রভাব ও বিদেশিদের প্রতিক্রিয়া

ইন্টারনেট বন্ধ হলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ক্ষিপ্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তারা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারে না, ফলে উদ্বেগ আরও বাড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়ায় প্রবাসীদের হতাশা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

বিদেশিরা নিশ্চিত হয় যে এই ধরনের পদক্ষেপ সরকারের বিরোধীদের দমন ও নিপীড়নের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞাকে কঠোর সমালোচনা করে এবং এটিকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীন মত প্রকাশের সরাসরি বাধা হিসেবে দেখে।

এই পরিস্থিতি বিশ্বমঞ্চে সরকারের নিন্দা ও কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। বিদেশি নাগরিক ও প্রবাসীরা অধিকতর সমর্থন ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ইন্টারনেট বন্ধের প্রতিবাদে প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ ও মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়।

রেমিট্যান্স না পাঠালে হুমকি এবং প্রবাসীদের কঠোর পদক্ষেপ

প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় কিছু ক্ষেত্রে হুমকিও দেওয়া হয় যে রেমিট্যান্স না পাঠালে দেশে ফিরলে জেলে পাঠানো হতে পারে। এমন পরিস্থিতি প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ, মানসিক চাপ এবং নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে তোলে।

হুমকির পরে প্রবাসীরা আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। তারা কেবল রেমিট্যান্স বন্ধ রাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে সরকার সমর্থিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। একইসাথে সামাজিক মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা ও প্রতিবাদ কর্মসূচি জোরদার করে। অনেক প্রবাসী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, বিদেশি সরকার ও গণমাধ্যমে এই হুমকি এবং নিপীড়নের তথ্য পাঠাতে শুরু করে।

কিছু প্রবাসী তাদের দেশের বন্ধু ও সহকর্মীদের মাধ্যমে মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও আলোচনাসভার আয়োজন করে বিদেশে রাজনৈতিক চাপ বাড়ায়। ফলে প্রবাসী সমাজে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্য ও প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়, যা আন্তর্জাতিক মহলেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার ভূমিকা ও প্রবাসীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি সরকারের অমানবিক নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে সরব থাকি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত অর্জনে কাজ করি, যাতে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিই, যা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমি নানা সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করি। তাদের যাতায়াত, ভিসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করি, যাতে অংশগ্রহণ সহজ হয়। অংশগ্রহণকারীদের জন্য আবাসন, খাবার ও পরিবহণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা নিশ্চিত করি, যাতে তারা কোনো অসুবিধা ছাড়াই অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারে। প্রবাসী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিটি অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলি। এসব কার্যক্রম কেবল সাংস্কৃতিক বিনিময়ই নয়, বরং সামাজিক ঐক্য ও প্রতিবাদের শক্তি বৃদ্ধিতেও বড়ো ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে প্রবাসী সমাজে সচেতনতা, সংহতি এবং মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ আরও সুদৃঢ় হয়।

বিভিন্ন দেশের এমপি, মন্ত্রী, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের অবহিতকরণ

এই সময়ে বাংলাদেশের জনজীবন ও গণতান্ত্রিক অধিকার সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। দেশের মানুষের ওপর

সরকারের অমানবিক নির্যাতন ও স্বৈরাচার শাসনের কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্য আমি বিভিন্ন দেশের এমপি, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেই, যাতে তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ও সমর্থন প্রদান করতে সক্ষম হন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলোকে অবহিত করা আমার কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের কাছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সরকারের শাসনকালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য পৌঁছে দিয়ে আমি তাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার জোরালো আহ্বান জানাই। পাশাপাশি সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনদের কাছে ঘটনাবলি সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে জানিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যাতে সত্য ঘটনা বিশ্বজনীন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এমপি, মন্ত্রী, মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চাপ ও সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নীতি নির্ধারণকারী ও গণমাধ্যমে বিষয়গুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষের কষ্ট ও সংগ্রামের কাহিনি বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়, যা ন্যায্য বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে, বিদেশি নেতৃবৃন্দের কাছে আমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করার জন্য দৃঢ় আহ্বান জানাই। এটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সমুন্নত ভবিষ্যতের জন্য অত্যাবশ্যক। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সচেতনতা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ আশা করতে পারে একটি শান্তিপূর্ণ ও মুক্ত সমাজের।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির দেশে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও বাস্তবতা উপস্থাপন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে বড়ো প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি রয়েছে, সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। এসব অনুষ্ঠানকে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে আমি দেশের বাস্তবতা তুলে ধরি, যাতে প্রবাসীরা ও তাদের আশপাশের জনগণ সচেতন হতে পারে।

সংগীত, নাটক এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে বাংলাদেশের চলমান দমন-নিপীড়ন ও স্বৈরাচার শাসনের বিষয়গুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করি। এর ফলে প্রবাসী সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় কমিউনিটি লিডার এবং সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে আরও বেশি মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছানো সহজ হয়।

বাংলাদেশে ঘটে চলা অমানবিক নিপীড়নের তথ্য স্থানীয় সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক মাধ্যমে প্রতিবাদের মঞ্চ তৈরি করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। এর মাধ্যমে প্রবাসী সমাজকে দেশের জন্য আরও সক্রিয় ও সমর্থনশীল করে তোলা সম্ভব হয়। এই কার্যক্রম প্রবাসীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, যা দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এক বিশাল শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের প্রবাসী ও বিদেশে বসবাসরত নাগরিকদের ভূমিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। এই আন্দোলনে শুধু দেশের ভেতর নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী ও

বিদেশে থাকা বাংলাদেশের নাগরিকরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে যেসব দেশে বড়ো প্রবাসী কমিউনিটি রয়েছে, তারা বিভিন্নভাবে আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক চাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

১. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ (নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ভারত, শ্রীলংকা)

এই অঞ্চলের বাংলাদেশি প্রবাসীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের খবর দ্রুত ছড়িয়েছে। তারা ঐ দেশের স্থানীয় জনগণ ও সরকারের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ন্যায়বিচারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ভারত ও মালদ্বীপে বসবাসরত প্রবাসীরা স্থানীয় জনমত গঠনে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কূটনৈতিক উদ্যোগে সহযোগিতা করেছেন।

নেপালের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধি বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি গভীর খোঁজখবর রেখেছেন এবং প্রেরণা দিয়েছেন। তারা এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা জোরদার করেছেন। আয়ন বাহাদুর শাহি, নেপালের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, পরিবেশ ও মানবাধিকারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। মন্ত্রী ও সাংসদ কাঞ্চন চন্দ্র বাদে বাগমতি প্রদেশ পরিষদের সদস্য হিসেবে আন্দোলনের তথ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরছেন। আরপিপি'র সাধারণ সম্পাদক ও ফেডারেল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী কুন্টি কুমারী শাহি মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংস্কৃতি, পর্যটন ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী আনন্দ প্রসাদ পোখরেল সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, নেপালের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে আন্দোলনের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও প্রেরণা জ্ঞাপন করেছেন। এই নেতাদের খোঁজখবর ও প্রেরণা বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানকে আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিশালী করেছে এবং নেপাল-বাংলাদেশ বন্ধুত্বকে দৃঢ় করেছে।

মালদ্বীপের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইকবাল আদম, প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের মন্ত্রী বার বার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চেয়েছেন এবং আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। হারিস মোহামেড, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্য বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী, আহমেদ সাঈদ মুস্তফা, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের উপমন্ত্রী, এবং হুসাইন নিহাধ, খেলাধুলা, ফিটনেস ও অবসর বিষয়ক উপমন্ত্রীও বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আব্দুল জালীল ইসমাইল, ইসলামী বিষয়ক উপমন্ত্রী এবং কিং সালমান মসজিদের ইমাম, যিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। একবার অনেক মন্ত্রী একত্রিত হয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আমাকে ফোন করে বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। আমি তখন তার কাছে দোয়া চেয়েছিলাম। মালদ্বীপের এই শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আন্তরিক সমর্থন ও খোঁজখবর বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী করেছে এবং আমাদের আন্দোলনের পক্ষে বড়ো উৎসাহ জুগিয়েছে।

ভুটানের অভিনেতা জ্যাকসন দুকপা এবং অভিনেত্রী সঙ্গীতা সর্মা আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের খোঁজ নিয়েছেন। এছাড়া শ্রীলংকার বিশিষ্ট ব্যক্তি দিলহারা আমাদের প্রতি গভীর সমর্থন প্রকাশ করেছেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন।

২. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, ওমান ও কুয়েতের প্রবাসীরা মোবাইল ও অনলাইন মাধ্যমে কর্মসূচি ও প্রতিবাদী বার্তা প্রচার করেছেন। তারা মাল্টিন্যাশনাল কর্মসংস্থান স্থানগুলোতে নিজেদের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু প্রবাসী সংগঠন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা চেয়ে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধিতে কাজ করেছেন।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, ওমান এবং কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের গণ-অভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তারা নিজেদের অবস্থান থেকে আন্দোলনের খবর ছড়িয়েছেন, তথ্যপ্রচার করেছেন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন। বিশেষ করে দুবাই ও সৌদি আরবের প্রবাসীরা এক সময় একটি প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করেছিল। এই মিছিলের কারণে তারা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তবে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে তারা দ্রুত জামিনে মুক্তি পান। এই ঘটনা প্রমাণ করে প্রবাসীদের মধ্যে দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাদের সংগ্রামের প্রতি অটল সমর্থন। মধ্যপ্রাচ্যের এই প্রবাসী সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শক্তিশালী করেছে এবং প্রবাসীদের সাহসিকতা ও সংগঠনের ক্ষমতা তুলে ধরেছে। তাদের অবদান দেশের ইতিহাসে গর্বের বিষয় হিসেবে স্মরণীয় থাকবে। প্রবাসীদের এই সহযোগিতা ও বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

৩. অন্যান্য এশীয় ও ইউরোপীয় দেশসমূহ (তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান)

এই দেশগুলোর প্রবাসীরা নিজেরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে July movement কে সমর্থন জানিয়েছেন।

তারা মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এছাড়া, স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশে চলমান আন্দোলনের সঠিক সংবাদ পরিবেশন এবং মিথ্যা তথ্য প্রতিহত করার কাজে ভূমিকা রেখেছেন।

জাপানের নাগরিক কেজি ওতাকাশি বাংলাদেশি প্রবাসীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে তাদেরকে ব্যাপক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তার নেতৃত্বে জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা একযোগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

কেজি ওতাকাশির উদ্যোগে জাপানের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের চলমান গণ-অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ প্রচার করা হয়। এতে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে জাপানি জনগণ ও নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশের বর্তমান সংকট সম্পর্কে অবগত হন এবং সেখানে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। কেজি ওতাকাশির ভূমিকা বাংলাদেশের আন্দোলনকে একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে এবং প্রবাসীদের মানসিক শক্তি ও উদ্দীপনা বাড়িয়েছে। জাপানে বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি এমন আন্তরিক সমর্থন দুই দেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নতুন অধ্যায় শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলবে।

৪. ওশেনিয়া ও প্যাসিফিক দ্বীপ দেশসমূহ (নিউজিল্যান্ড, টোঙ্গা, ফিজি)

এই অঞ্চলের বাংলাদেশিরা মূলত গণমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং দূতাবাসের মাধ্যমে July uprising -এর তথ্য ছড়িয়েছেন। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে সমর্থন চাইছেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

৫. পশ্চিমা দেশসমূহ (ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া)

এই দেশগুলোর বাংলাদেশি প্রবাসীরা বৃহত্তর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরেছেন। তারা নানা মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় লবিং কার্যক্রম চালিয়েছেন। বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি সামাজিক আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। তারা বিদেশি সরকারের কাছে বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিবাদ সমাবেশ, সেমিনার ও বিক্ষোভের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন।

১৯শে জুলাই ও ৫ই আগস্ট যাত্রাবাড়ী ও বাড্ডার ঘটনা

১৯শে জুলাই, যাত্রাবাড়ী রায়েরবাগ: এই দিনে সর্বকনিষ্ঠ শহিদ আব্দুল আহাদের মৃত্যু ঘটে, যিনি প্রিয় বন্ধু আবুল হাসান শান্তর একমাত্র সন্তান ছিলেন। তার আত্মত্যাগ রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯শে জুলাই আমি ভারতের কলকাতায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। তবে আগের দিন থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সকল

প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। বিকল্প পথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ চলছিল। ভারতের বাংলাদেশ সম্প্রীতি উৎসবে বক্তব্য প্রদানকালে আমি দেশের বাস্তবতা তুলে ধরেছি এবং কালো পাঞ্জাবি পরে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কথায় এবং ঘটনাবলির উপলব্ধিতে শত শত মানুষের চোখ ভিজে উঠেছিল।

৫ই আগস্ট রাত, বাড্ডা থানার সামনে: গোলাগুলির সময় আমার সহকর্মী মতিন নিহত হন এবং নবীন আহসান গুলিবিদ্ধ হন। একসময় যারা ছাত্রদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করেছিলেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে অপদস্ত করেছিলেন, আজ তাদের সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করতে হয় 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা। এই জনতা হলো জাগ্রত ছাত্র-জনতা, যার অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন তৎকালীন সরকার প্রধান।

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্কুলছাত্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নারী, শ্রমিক ও পেশাজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। বাম, ডান ও মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল এবং তাদের সমর্থকরা সক্রিয় ছিলেন। নারীরা, শ্রমিক ও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা যারা সমাজে প্রান্তিক হয়ে থাকেন তাদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন। নারীরা নানা পর্যায়ে আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

এই আন্দোলনে প্রমাণিত হয়েছে দেশের প্রকৃত মালিক জনগণই। জনগণের শক্তিই সবচেয়ে বড়ো শক্তি। দুই হাজারের অধিক ছাত্র-জনতার শাহাদতের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

৫ই আগস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের চূড়ান্ত ফলাফল

৫ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকৃতি পায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি কার্যক্রম শুরু হয় এবং তাদের বিচারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া হয়। পাশাপাশি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক তদন্ত পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়, যা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মাইলফলক স্বরূপ। প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক সমর্থকদের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়, যাদের সমর্থন ও উৎসাহ আন্দোলনের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংবিধান ও আইনের শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে দেশের ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারব্যবস্থা দৃঢ় হয়। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং সামগ্রিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়।

মো. গোলাম ফারুক মজনু: সম্পাদক ও প্রকাশক, সাপ্তাহিক বিপ্লবী জনতা, দ্যা ডেইলি ট্যুরিজম টাইমস

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পেল ৩০ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে ৩০শে জুলাই ঢাকার পেট্রোবাংলায় কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো)-এর মধ্যে একটি গ্যাস বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেজিডিসিএল-এর পক্ষে কোম্পানির সচিব কবির উদ্দিন আহম্মদ এবং কাফকো'র পক্ষে সিসিও ও কোম্পানি সচিব খাজা সাইদুর রহমান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মাধ্যমে কাফকো-তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে, যা দেশের কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী কেজিডিসিএল কাফকো-কে গড়ে দৈনিক ৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করবে। এই বিপুল পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ কাফকোর সার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফেকা)- এর পক্ষে শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান কেজিডিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এস এম মঈন উদ্দীন আহম্মেদের নিকট বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ৯২৩ কোটি ৮১ লাখ ১৮ হাজার ৬১৬ টাকা এবং ডিমান্ড চার্জ বাবদ ৩৪ কোটি ৩৭ লাখ ৩৫ হাজার ৮৪৮ টাকার দুটি চেক হস্তান্তর করেন।

এ পর্যায়ে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী সালাহউদ্দিন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমানের নিকট গ্যাসের বকেয়া বিল বাবদ ৬৩৪ কোটি ১ লাখ ৭৭ হাজার ২৬৫ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

প্রতিবেদন: শারমিন শান্তা

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সমাজ

প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

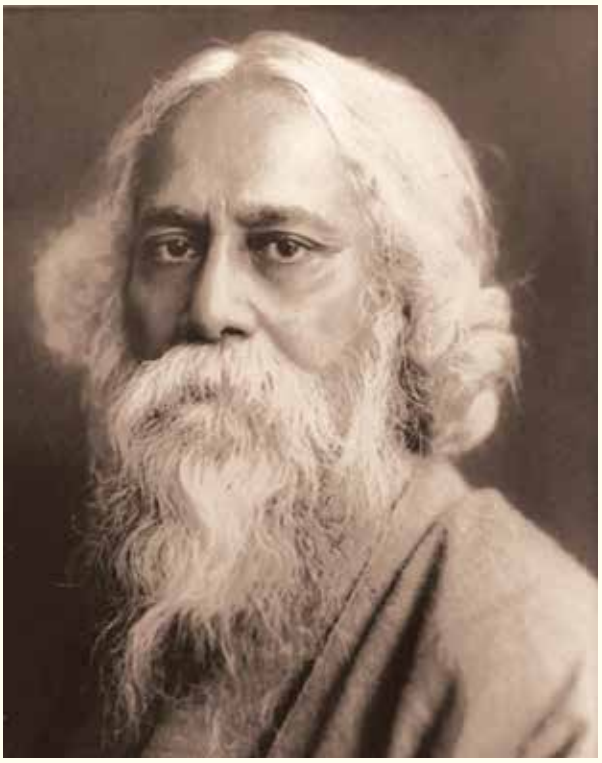

কবি রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছে বিশ্বকবি। নির্বিশেষে সর্বজনীনতা অবশ্যই আছে রবীন্দ্রনাথে, কিন্তু তাঁর বিশেষ পরিচয়, একান্ত ও অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর বাঙালিত্বের মধ্যেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বভাব ও ঝোঁক তাঁর বাঙালিত্ব দ্বারাই অনিবার্য ও স্বাভাবিকরূপে প্রভাবিত এবং সেই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষায় তিনি শ্রেষ্ঠতম লেখক; ভাষার তিনি দাস ছিলেন না, ভাষা তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল– একথায় অসত্য নয় যদিও, তবু ভাষার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তা অবজ্ঞেয় নয়, এ সেই ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতম লেখকের ক্ষেত্রেও যা অপরিহার্য রূপে কার্যকর। কিন্তু আরও বড়ো সত্য আছে, একটি প্রধান সত্য, এমনকী হতে পারে প্রধানতম সত্য। সে হচ্ছে এই ঘটনা যে, রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির লেখক ছিলেন না, লেখক ছিলেন মহাকাব্যের। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা ট্র্যাজেডির দিকে ঝুঁকে পড়েনি, ঝুঁকেছিল মহাকাব্যের দিকে। যদিও তিনি কোনো মহাকাব্য লেখেননি, গীতিকাব্যই লিখেছেন।

ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি যে, তিনি ট্র্যাজেডির লেখক হবেন না কি লেখক হবেন মহাকাব্যের। এই সিদ্ধান্ত এসেছে তাঁর নিয়ামক বাঙালিত্ব থেকে।

মহাকাব্য স্থানকে যত গুরুত্ব দেয় ট্র্যাজেডি তত দেয় না। সর্বজনীন হয়েও মহাকাব্য বিশেষ দেশের ও দেশান্তর্গত কালের। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশেরই মানুষ– দেশের অতীত ও বর্তমানের। কিন্তু সে-কথা আমরা বিশেষভাবে ভাবছি না এখানে। বিশেষভাবে ভাববার কথা এটি যে, ট্র্যাজেডির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অপক্ষপাত তাতে তাঁর বাঙালিত্বই প্রতিফলিত। বাঙালির জীবনে নাটক অল্প, ট্র্যাজেডি স্বল্পতর। দুঃখ ও পীড়া বাঙালির জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক বস্তুত, কিন্তু যে দুঃসাহস, অশুভের সঙ্গে সংগ্রামে যে দৃঢ়তা থাকলে দুঃখ ও পীড়া ট্র্যাজেডিতে উত্তীর্ণ হয়– অভাব সেই প্রচণ্ড সাহসের, সেই অনমনীয় দৃঢ়তার। এই কারণে একদিকে যেমন তুষ্টি আসে সহজে, অন্যদিকে তেমনি সন্ধি ও সহযোগিতাই প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়ায়। অশুভ অবশ্যই আছে, জানি সে রয়েছে, তবু তাকে জানতে চাই না সম্পূর্ণরূপে, চিনতে চাই না পরিপূর্ণ পরিচয়ে, কেননা ভয় আছে দ্বন্দ্বে। সম্মুখ মুখোমুখিতে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অশুভ আছে, কিন্তু তাঁর চিত্রকলাতে যেমন আছে, সাহিত্যে তেমন নেই। সাহিত্যে অশুভ প্রায়ই অবগুণ্ঠিত, অনেক সময়ে কুণ্ঠিত এবং যখন প্রকাশিত যেমন 'শিশুতীর্থ', তখন শুভজন্মের জয়ধ্বনি দ্বারা বিধৌত। ভয়ংকর ও সুন্দর হয়ে আছে তাঁর জগতে, যেমন এসেছে রানি সুদর্শনার কাছে। অশুভ চরম নয় কোথাও, শেষ কথাও নয় কোনো রচনায়। মানুষের প্রবৃত্তিকে চিত্রিত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে। তুলনাবিহীন পাশবিক অন্ধকারের চিত্র আছে 'চতুরঙ্গে'। কিন্তু সে-প্রবৃত্তি মানবিকই, অশুভ নয় আধিদৈবিক। কোনো বিবেচনাতেই পাপ নয়; পদস্খলনের আশঙ্কা শুধু। বিপরীত পক্ষে সে ব্যাধিও নয় সমাজের।

জীবনে দুর্ভোগ এত বেশি রূঢ় যে আমরা নতুন করে দুর্ভোগকে দেখতে চাই না সাহিত্যে। আমরা অন্তরাল চাই। সস্তা চলচ্চিত্র, চটুল গান– এসব বস্তু মধ্যবিত্ত বাঙালির পলায়ন কেন্দ্র। সাহিত্যেও তাই আছে, পলায়নের আকাঙ্ক্ষা আছে, খুব বড়ো করে লেখা। আধ্যাত্মিকতাও পলায়নের বাসনা থেকেই উদ্ভূত। সেখানে, আধ্যাত্মিক চিন্তায়, আত্মার সদগতি কামনা নেই, দৈহিক সুখের গোপন ও ভীরু লালসা আছে বড়ো হয়ে। নাটক যে আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বলতম অংশ নয় তার কারণ অবশ্যই দ্বন্দ্ব-ভীরুতা। রবীন্দ্রনাথের সফলতা নাটকেই সর্বাপেক্ষা স্বল্প। কেননা তাঁর নাটকে শুভের জয় পূর্বনির্ধারিত। আর তাঁর পাঠকও ট্র্যাজেডি চায়নি পড়তে, চেয়েছে রূপকথা– যা না কি পুরস্কারে ও তিরস্কারে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের তাই ট্র্যাজেডি লেখবার কথা নয়– তিনি বাঙালি বলে। সেটাকে তাঁর দুর্বলতা বলার দরকার নেই, সেটা তাঁর প্রতিভার নিজস্ব স্বভাব। কোনো রূপকল্পে লিখেছেন লেখক তা দিয়ে তাঁর বিচার হয় না, বিচার হয় লেখার শিল্পমূল্য দিয়ে, শিল্পগত উৎকর্ষ দিয়ে। তদুপরি রূপকল্প হিসেবেও মহাকাব্য যে

ট্র্যাজেডির পশ্চাদ্‌বর্তী এমন কথাও জোর দিয়ে বলবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথ একবারই লিখেছেন, 'গোরা' তে। তখন উদ্দীপনা ছিল সমগ্র দেশে, ঐক্য ছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। সেই ঐক্য ও উদ্দীপনা একটা বড়ো বস্তু, তেমন বস্তু যার অভাব ঘটলে মহাকাব্য রচনা হয় না। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন একই সঙ্গে ঐক্য ও উদ্দীপনা এনেছিল এই দেশে, অন্তত দেশের সেই অংশে, যে অংশে সামাজিক অবস্থান ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু পরে উদ্দীপনার অবসান ঘটেছে, ঐক্যও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নেতিবাচক শক্তিই ছিল প্রধান যখন তার লক্ষ্য অর্জিত হলো তখন অবসানের ক্লান্তিতে জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ যতটা দ্রুত বিস্তারশীল হয়ে উঠল তত দ্রুত তার বিস্তার বোধ হয় আগে আর কখনো হয়নি। আপোশপন্থিরা একদিকে গেলেন, নিরাপোশবাদীরা অন্যদিকে। প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত হিন্দুর স্বার্থ এবং উন্মেষকামী মধ্যবিত্ত মুসলিম স্বার্থে সংঘাত হয়ে দাঁড়ালো অপরিহার্য। গ্রাম ও শহরের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেল ক্রমশ। নতুন কোনো 'গোরা' লেখা আর সম্ভব হলো না রবীন্দ্রনাথের মতো অসামান্য শিল্পীর পক্ষেও। সেই পথে আর গেলেন না তিনি, অসামান্য বলেই গেলেন না, সামান্য হলে যেতেন হয়ত এবং ব্যর্থ হতেন দৃষ্টিকটুরূপে। কেননা মহাকাব্য নিজস্ব সাংস্কৃতিক পটভূমি ছাড়া রচিত হয়নি কখনো, হতে পারে না কিছুতেই। অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি ছিল রবীন্দ্রনাথের, তাই খণ্ড কবিতা লিখেছেন অজস্র, ছোটোগল্প লিখেছেন বহু, উপন্যাস লিখেছেন অনেক, কিন্তু মহাকাব্য আর লেখেননি, উদ্যমও নেননি লেখার। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা'– সমগ্র দেশ এদের কোনোটিতেই আসেনি, এমনকি 'যোগাযোগ'– এও নয়। ছোটোগল্পে তো আসবার কথাই ছিল না, কবিতাতে ততোধিক।

মহাকাব্যিক প্রতিভা মহাকাব্য আর দ্বিতীয়বার লিখলেন না, 'গোরা'কে ছাড়িয়ে গেল না সেই প্রতিভা, যা নিজেকে নিজে অতিক্রম করেছে সমগ্র জীবনে। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে নন, কারণ বাঙালি জীবনের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা, নির্বেদ ও গ্লানি। যে ঐক্য ও উদ্দীপনা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন একদিন সম্ভব করে তুলেছিল বাংলাদেশে আবার তার উদ্ভব হতে পারত যদি সূচনা হতো নতুনতর, প্রবলতর কোনো আন্দোলনের। সে আন্দোলনকে অবশ্যই হতে হতো সমাজতান্ত্রিক। কেননা অন্য কোনো আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হতো না শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ঐক্য আনয়ন করা। ইংরেজ বিরোধিতা বঙ্গভঙ্গ-রদের পরবর্তী সময়ে এক পথে অগ্রসর হয়নি, নানা পথে গিয়েছে– অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হয়নি বাংলাদেশে। হলেও তাতে রবীন্দ্রনাথের থাকবার কথা ছিল না, বিপ্লব-পরবর্তী রুশ দেশ ভ্রমণ সত্ত্বেও নয়। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে, সভ্যতার গভীরে যে সংকট তাকে প্রকটিত করেছেন লেখার মধ্য দিয়ে, কিন্তু সমস্ত বক্তব্য যে একত্র ও এক হয়ে বৃহৎ কোনো রচনার আকার নেবে তা আর হয়ে ওঠেনি।

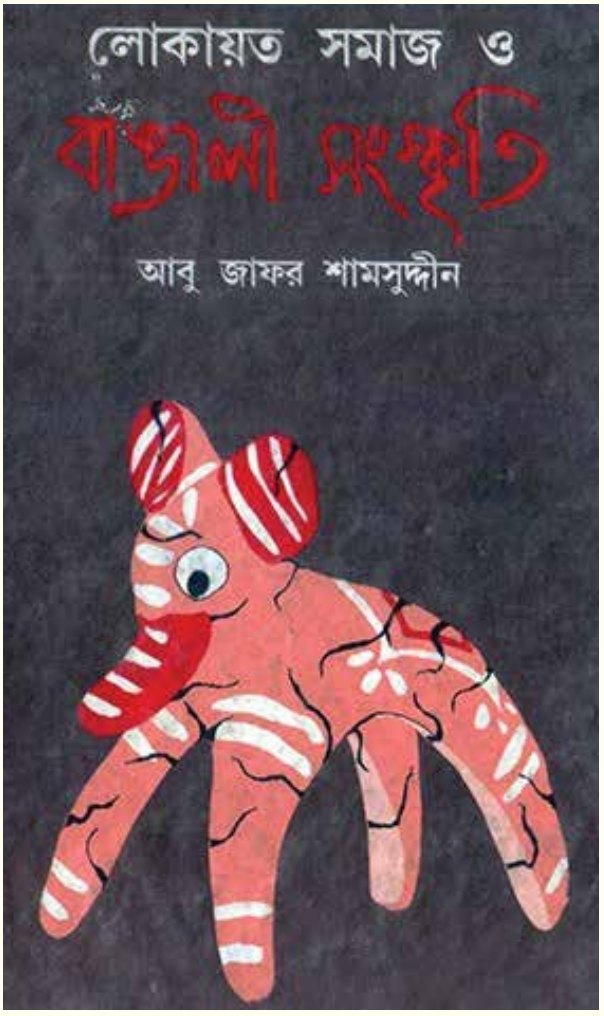

রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি সেটা সত্য এই দিক থেকেও যে, বাঙালি জীবনের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে তিনি যেভাবে প্রতীয়মান করে তুলেছেন শুধু লিখে নয়, না-লিখেও, তেমনটি অন্য কেউ পারেননি। পরবর্তীকালে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও, পাবে যে তার লক্ষণ রবীন্দ্রনাথেই ছিল। অন্যদিকে আবার এটাও লক্ষ করা খুব সহজ যে, 'গোরা'র লেখক যখন 'শেষের কবিতা' লেখেন তখন যে তাঁর শক্তি বৈচিত্র্য ও সৃজন-বিপুলতাই শুধু প্রকাশ পায় তা-ই নয়, তদ্দ্বারা মহাকাব্যের অপস্রিয়মাণতাও প্রমাণিত হয়। বাক্যবীর অমিত রায় সেই অপস্রিয়মাণতারই প্রতিভূ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বড়ো লেখকেরা দুই শ্রেণির, শেক্সপীয়রের মতো নাটকীয়, অথবা টলস্টয়ের মতো মহাকাব্যিক। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের লেখক, তবু তিনি টলস্টয়ের মতো নন, সম্পূর্ণত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা টলস্টয়ের নেই। দরিদ্র দেশে আধ্যাত্মিকতা না থাকলেই নয়। জীবনে যে ব্যক্তি স্বপ্নের মতো সমৃদ্ধ তার পক্ষে স্বপ্ন না দেখলেও চলে; কিন্তু যে ব্যক্তি দরিদ্র স্বপ্ন না থাকলে তার জীবন থাকে না। বস্তুর অভাব ঘটলে আধ্যাত্মিকতার সুবিধা হয়, বিশেষ রকমের।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই আধ্যাত্মিক ছিলেন না ঐ নোংরা বস্তুতান্ত্রিক অর্থে। তাঁর জীবনে বস্তুর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর বাঙালি সত্তা, তাঁর সামাজিক ঐতিহাসিক চরিত্র যে তাঁকে অনিবার্য হতে আধ্যাত্মিকতার পথানুসরণে বাধ্য করছে সে-বিষয়ে সন্দেহ কোথায়। সমৃদ্ধ দেশে জন্মগ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মবাদী হতেন না। হয়ত হতেন বীরত্ববাদী, হয়ত-বা বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা।

বাঙালি জীবনে শ্রেণিভেদ ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির অত্যন্ত গভীর অবস্থান জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে, বলা যায় বীরকে, গুরুত্ব দিয়েছে অত্যধিক এবং সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে সুবিধাভোগী শ্রেণির নেতৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে। এই মানসিকতা এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও অব্যাহতি দেয়নি। একদিকে তিনি মহাপুরুষের কথা বার বার বলেছেন, প্রতীক্ষা করেছেন মহামানবের, অন্যদিকে আবার একক উদ্যম নিয়েছেন স্থাপন করবেন আদর্শ খামার, আদর্শ বিদ্যালয়, আদর্শ সমবায় ও গ্রাম। মহামানবিক একক উদ্যমে একাকী হয়ে পড়েছেন, সফলতা আসেনি, নাড়া খায়নি সমাজে। নেতৃত্ব থেকেছে ব্যক্তির হাতে, ব্যক্তি উপচে শ্রেণির হাতে কখনো কখনো হয়তবা, কিন্তু তার বাইরে কখনো যায়নি, যায়নি জনসাধারণের কাছে এবং ব্যর্থতার কারণও এইখানেই ছিল, জনসাধারণের এই অংশগ্রহণ না-করায়। রবীন্দ্রনাথের পর সামন্তব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষীণ হয়েছে। প্রবল হয়েছে মধ্যবিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন তিনি রোমান্টিক! আমারে শুধাও যবে, 'এরে কভু বলে বাস্তবিক'? আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক' ('নবজাতক')। আরো স্পষ্ট কথা আছে 'সানাই'য়ে : এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্টিক। গলিতেই বসবাস বাঙালির, তবু সে জন্ম রোমান্টিক। গলিকে গলি বলে মানে না, থেকে থেকে খোঁজে দক্ষিণের বাতাস, খোঁজে অলক্ষ্য আকাশ। ফলে গলি গলিই থেকে যায়, বদলায় না, বাতাস থাকে অবরুদ্ধ, আকাশ অলক্ষ্য; শুধু হাল্কা কল্পনা থাকে সজাগ। হরিপদ কেরানিরা আকবর বাদশার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকে। 'ছিন্নপত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ পল্লির চিত্র দিয়েছেন এই রকম: 'যখন গ্রামের চারদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা এখানে-সেখানে জলে-কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠান্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্য কর্ম করে যায়– তখন সে দৃশ্য কোনো মতেই ভালো লাগে না! ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলে-ওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না– এতো অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়।' কিন্তু এই পল্লি ভিন্নতর হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়, তার বাস্তবতার জায়গায় জেগে উঠেছে কাব্যময়তা। 'যেতে যেতে পথপাশে/ পানা পুকুরের গন্ধ আসে/ সেই গন্ধে পায় মন/ বহুদিন রজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।' এমন ক্ষেত্রে পানাপুকুরের দুর্গন্ধ সত্য নয়, সত্য অন্য এক অনুভবের আনন্দ। বাস্তববিনাশী এই রোমান্টিসিজমের মধ্যে যে বাঙালিত্ব আছে, তা রবীন্দ্রনাথেও ছিল।

প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাক্, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলা ইশারা ভাষার ডাটাসেট উদ্বোধন

বাক্, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে তাল মেলাতে বাংলা ভাষাভিত্তিক একগুচ্ছ সফ্টওয়্যার নিয়ে আসছে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বাংলা ভাষায় স্ক্রিন রিডার, ব্রেইল কনভার্টার ও ইশারা ভাষা ডিজিটাইজেশনভিত্তিক সফ্টওয়্যার শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এছাড়াও ইশারা ভাষার একটি ডেটাসেট উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২২শে জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত 'প্রতিবন্ধিতা অতিক্রমণে প্রযুক্তি' শীর্ষক এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, 'প্রযুক্তিগত সমতা প্রতিষ্ঠায় অ্যাক্সেসিবিলিটি একটি মৌলিক বিষয়। প্রতিবন্ধিতাকে উপেক্ষা করে নয়, বরং প্রযুক্তির মাধ্যমে তা অতিক্রম করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রকল্পকে একটি ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ও একাডেমিয়াকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ জন্য উন্নয়নাধীন বাংলা ভাষায় স্ক্রিন রিডার, ব্রেইল কনভার্টার ও ইশারা ভাষা ডিজিটাইজেশনভিত্তিক সফ্টওয়্যার খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রযুক্তিকে কেবল ডিজিটাল অ্যাক্সেস নয়, বরং দক্ষতা, অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় বাংলা ইশারা ভাষার ডেটাসেট-এর উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। যা এখন https://huggingface.co/datasets/banglagov/Ban-Sign-Sent-9K-V1 এই ঠিকানা থেকে উন্মুক্তভাবে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে। এসময় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও নির্মাণাধীন সফ্টওয়্যারগুলোতে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ইশারা ভাষার দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আরাফাত সুলতানা লতা ও আরিফুল ইসলাম।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

কাঁচ-ভাঙ্গা রাতের গল্প: প্রকৃতির শব্দ খোঁজেন রূপা

ড. শিহাব শাহরিয়ার

এদেশে ইংরেজি জানা খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অন্যতম একজন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তাঁর পেশাও ঐ বিষয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক তিনি। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেও বিশিষ্ট। ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত বিনয়, বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ, বক্তব্য, কথা ও উপস্থাপনায় তিনি জয় করে ফেলেছেন অসংখ্য মানুষের মন-হৃদয়। তাঁর সম্পর্কে আরো বলা যায়, তিনি ধারণ করেন বাংলাদেশ, বাঙালি সংস্কৃতি ও মানবতাবাদী চেতনা। এমতাবস্থায় আমরা এই বিষয়গুলো স্বীকার করেই আলোকপাত করতে চাই, একজন লেখক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে। সেখানেও আরো নির্দিষ্ট করতে চাই, একজন কথাশিল্পী হিসেবে। কথাশিল্পীর মধ্যেও আবার একজন গল্পকার হিসেবে তিনি কতটা বিশিষ্ট ও মেধাবী তার দিকে একটু নজর দিতে চাই। নিঃসন্দেহে তিনি এক্ষেত্রে মেধাবী ও শক্তিমান। যদিও পুরস্কারের জন্য কোনো লেখকই লিখেন না, তারপরও বাংলাদেশের লেখককুলের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারটি বেশ সম্মান ও গৌরবের। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর ভিন্ন ধারা ও ব্যঞ্জনাধর্মী গল্পের জন্য ইতোমধ্যে অর্জন করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার। বর্তমান এমন বাস্তবতায় তাঁর একটি গল্পের সামান্য ব্যবচ্ছেদ করতে সাহস করছি। আসলে ব্যবচ্ছেদ নয়, গল্পটির উপর একটু দৃষ্টি দিচ্ছি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের *কাঁচ-ভাঙ্গা রাতের গল্প* গ্রন্থের শুরুতেই বলা আছে, 'সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পের ধরন বাংলাদেশের প্রথাগত গল্প থেকে আলাদা। একে কেউ বলেছেন অপ্রচলিত, কেউ বলেছেন নিরীক্ষাধর্মী কিন্তু যেভাবেই দেখা হোক, এ গল্পগুলোর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। প্রখর জীবনবোধের ছোঁয়া লেগে থাকে তাঁর সমস্ত সংবেদী গল্পে। কখনও তাঁর নগর জীবনের জটিল আবর্তে রুদ্ধ, কখনওবা কবিতার মতো গহনচারী। সমসাময়িক জীবনের বিচ্ছিন্নতা আর নিঃসঙ্গতা তাঁকে বার বার আক্রমণ করে। তিনি মানুষের বোবা পরিস্থিতির বর্ণনা দেন উত্তর আধুনিকতার নানা অনুষঙ্গে।' উপর্যুক্ত কথাটুকু মাথায় নিয়েই প্রবেশ করছি তাঁর 'প্রেম' গল্পের ভেতরে।

গল্পের মূল চরিত্র রূপা। হাওর তীরবর্তী নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা নামক মফস্বল অঞ্চলের কিশোরী এবং পরবর্তীতে পূর্ণ নারী রূপার অব্যক্ত ও অপ্রস্ফুটিত প্রেমের আশি দশকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। রূপার সময়কাল বাংলাদেশের আশির দশক এটি আবিষ্কার করা যায় কয়েকটি কারণে। গল্পকার যে মুড়ির টিন নামক গণপরিবহণটির কথা শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, সেটি তৎকালীন ঢাকার শহরের নামকরা একটি বাহন।

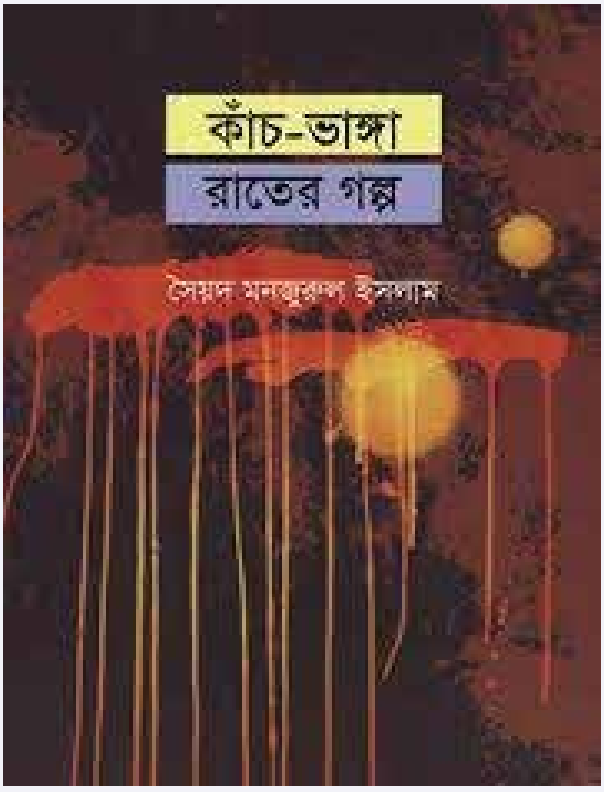

যখন প্রথম চরণেই বলেন, 'জাহিদের সঙ্গে রূপার দেখা হয়েছিল একটা মুড়ির টিনে'। দ্বিতীয়ত: গল্পের দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে গল্পকার বলছেন, 'প্রেম? বিরহ?...রূপা এমনকি বিরহজনিত শোকে, অথবা উদাসী তরুণের (প্রেমিকের) অবহেলায় ডুকরে কেঁদেও উঠেছে কখনো কখনো'। সুতরাং এই যে সময়? এটি তথ্য প্রযুক্তির স্বল্প আলোযুক্ত আশির দশকের প্রেমাকাঙ্ক্ষী মফস্বলী এক তরুণীর মনোভাব, মনোকাঙ্ক্ষা, মনোবাসনা, মনোকামনা, মনোবেদনার সত্যিকার চিত্রই ছিল সে সময়ে। বলা যেতে পারে, একজন রূপার মাধ্যমেই গল্পকার তুলে আনতে পেরেছেন তৎকালীন শত-সহস্র উঠতি নারীর প্রেম, প্রেম-জনিত মানসিক অবস্থান, দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব-উত্তীর্ণ যাপিত সময়ে নিজের অসহায় সমর্পণ। রূপার কিশোরী মনের কল্পনা, স্বপ্ন ও প্রেমাকাঙ্ক্ষা দিয়েই শুরু হয়েছে গল্পের বয়ান। রূপার প্রথম পুরুষ জাহিদ, তারপর ইব্রাহীম, আসাদ, আতিয়ার, মুক্তাদির, তারপর একটি রুমাল, একটি ছেলে ও একজন অধ্যাপক। অবশেষে পূর্বধলার প্রথম পুরুষ জাহিদের সঙ্গে ছাত্রীজীবন উত্তীর্ণ সময়ে আবার দেখা এবং নতুন দ্বন্দ্বের অবতারণা। রূপার অবস্থান জন্মাঞ্চল পূর্বধলা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা। ঢাকারই পরিবেশ-প্রকৃতির নানা

অবয়বের মধ্যে ডুবে থেকেই লালচে চুলের যুবকটিকে নিয়ে তার সিদ্ধান্তহীনতা, মানসিক দুর্বলতার ক্ষণে পাখি, রোদ আর নিসর্গের কাছে কিছুটা সময় আত্মসমর্পণ, মানুষ যে মূলত একা এক পর্যায়ে এই বিষয়টির অনুভব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে লালচে রঙের যুবকের আশ্রয় গ্রহণ। অবশেষে সমিল চরণের কবিতার মতো পরিসমাপ্তি।

গল্পটি সরল রেখায় এগিয়েছে। জটিলতা নেই বাক্যে, শব্দে, অনুষঙ্গে। যৌবন-প্রস্ফুটিত প্রেমপ্রত্যাশী একজন নারী রূপা জীবনের কাঙ্ক্ষিত পুরুষের মনোকামনায় ছুটেছেন, কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেননি ভালোবাসার কথা। কখনো আশ্রয় নিয়েছে প্রিয় রুমালের। রুমাল রাস্তায় ফেলে দিয়ে যুবকের আকর্ষণ প্রত্যাশা করেও বার বার পরাজিত হয়েছে। এজন্য মন খারাপ হয়েছে বা করেছে। নীরবে নিভৃতে নিজেকে কষ্টের মধ্যে বেদনার মধ্যে সমর্পণ করেছেন। তবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখাননি বা হয়ওনি। পাশাপাশি এক ধরনের মৃদু জেদ ও বিপ্লবও কাজ করেছে রূপার ভেতর। উচ্চশিক্ষার শেষ পর্যায়– বাড়িতে বাবা-মা বিয়ে উপযোগী মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইবেন এটিই স্বাভাবিক কিন্তু রূপা রাজি হয়নি। সে চাকরি পেয়েছে, চাকরি করবে এবং খুঁজতে থাকবে একজন জীবনসঙ্গী। এই অবস্থানের মধ্যেই দেখা হয় গল্পের প্রথম শব্দ, রূপার প্রথম পুরুষ জাহিদের সঙ্গে এবং মান-অভিমানের কয়েকটি দিন শেষ করে প্রেম পূর্ণতায় রূপা তার আপাতত একটি জীবনকে বেছে নেন।

গল্পকার মাঝে মাঝেই প্রবন্ধের আঙ্গিকে বলেছেন যেমন বলা বাহুল্য, কিন্তু আমরা যেহেতু রূপার সঙ্গে আছি, এটি রূপার অভ্যাস আমাদের কিছু করার নেই, (বেশি ছেলে-মেয়ে হলে এ গল্পের সমস্যা হতো), কিম্বা (যারা চন্দ্রিমা উদ্যানে গেছেন, তারা রূপার অস্বস্তিটা বুঝবেন) ইত্যাদি। মনে হয়, গল্পকার সচেতনভাবেই এগুলো ব্যবহার করেছেন, যা হতে পারে ভিন্ন ফর্ম তৈরি, নতুন ঢং নির্মাণ, কিম্বা হতে পারে লেখকের মুনশিয়ানা। মনে করি, এটি আমার কাছে কেবলই নতুন। অবশ্য এসব ছাপিয়ে গল্পকার একটি সময় পর্বের বাংলাদেশের জীবনকে তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন যা গতিমান বা বহমান ফ্রেমে বন্দি থেকেও প্রেম এগিয়ে গেছে, নায়িকা রূপা আত্মনিবেদন থেকেছেন তার একান্ত ভালোবাসার অনুভব নিয়ে। জাহিদও তার পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে রূপাকে পাওয়ার প্রত্যাশী হয়ে উঠেন। এক সময় দুজনের প্রেমভাবনা মিলে যায়।

সবশেষে বলা যেতে পারে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে গল্পকার সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর গল্পের বিষয়, চরিত্র, আঙ্গিক ও আধুনিকতায় নিশ্চয়ই 'প্রেম' গল্পের পর্যায়ে থাকবেন না। একথা সত্যি যে, 'প্রেম' একটি নিটোল প্রেমের গল্প হলেও, এখানে আছে একটি টসটসে জীবন। জীবন মানেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনা ও জটিলতার ধূম্রজাল। প্রেম প্রকাশে বার বার ব্যর্থ নায়িকা রূপাও মন খারাপ থাকা অবস্থায় রাতের বাতাসের কাছে, গাছের পাতাদের কাঁপনের কাছে, রাত জাগা পাখির কলরবের কাছে কিংবা চূড়ান্ত অর্থে প্রকৃতির শব্দের কাছে নিজের সান্ত্বনা বা আশ্রয় খোঁজেন। আসলে, প্রকৃতিই কখনো কখনো মানুষের বড়ো বন্ধু বা বলা যায় চিরকালের বন্ধু হয়ে ওঠে।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক, গবেষক ও সাবেক কিপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

ডাক বিভাগের কোষাগার ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল রূপান্তরের উদ্বোধন

আইবাস প্লাস প্লাস (iBAS++) সিস্টেমে ডাক অধিদপ্তরের বিজনেস প্রসেস মডিউল 'Supply of Funds and Other Remittance Transactions of Bangladesh Post' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ১লা জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ডাক ভবনে তিনি ডাক বিভাগের কোষাগার ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, আইবাসের সবগুলো মডিউলকে যদি আমরা এক জায়গায় এনে একটা সুপার অ্যাপ করতে পারি তাহলে আরো কার্যকর হবে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে আইবাসের মাধ্যমে সংকুলান করতে চাই। তিনি বলেন, ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন মাস্টারপ্ল্যান কিংবা ডেটা গভর্নেন্স অথরিটির সাথে আইবাসের ইভ্যালুয়েশন প্ল্যানকে সেন্টার পয়েন্টে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে আইবাসের মাধ্যমে ডিজিটালাইজড করতে হবে। এ বিষয়ে ডাক বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ফয়েজ তৈয়্যব আরো বলেন, আইবাস প্লাস প্লাসের মতো যে কারিগরি স্থাপনাগুলো আছে সেগুলোকে সিআইই (ক্রিটিকাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার) হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। এটা হলে স্থাপনাগুলো সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের আওতায় কিছু সুরক্ষা পাবে। এর পাশাপাশি আমরা একটা ড্যাশবোর্ড করতে পারি যাতে রিয়েল টাইম ট্রানজেকশন দেখা যাবে, একাউন্টিংয়ের কেপিআইগুলো দেখা যাবে। যার মাধ্যমে সাকসেস রেটগুলো দেখতে পারব।

উল্লেখ্য, iBAS++ সিস্টেমে নির্মিত এই মডিউলটি ডাক বিভাগের ৭২টি প্রধান ডাকঘরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কোষাগারের সঙ্গে অর্থ উত্তোলন, জমা ও লেনদেন কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় করবে। এই মডিউলের কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে সরকারি হিসাব ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, সময়ানুবর্তিতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত হবে।

প্রতিবেদন: সাবিহা শিমুল

নজরুলের *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থ: শতবর্ষে মানবতার জয়গান

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

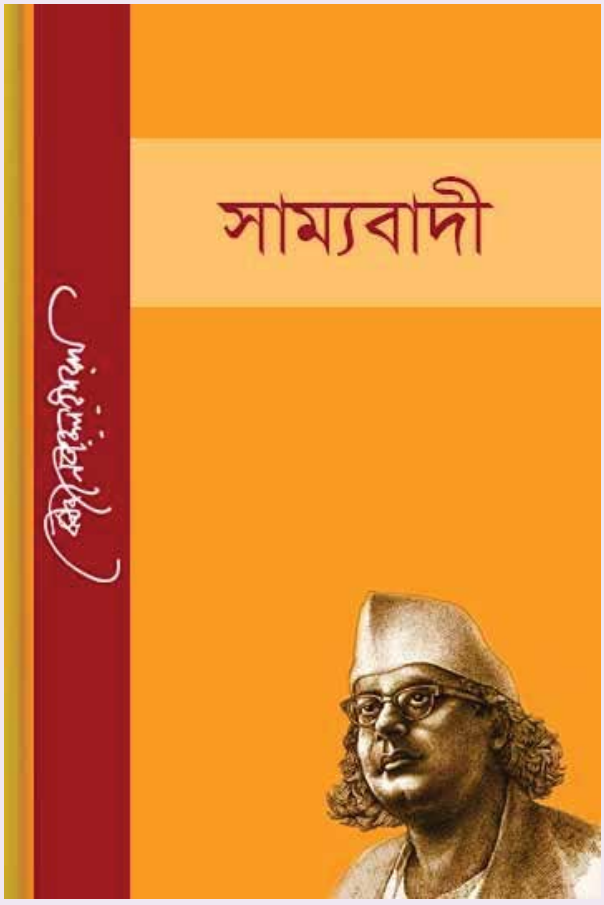

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে (পৌষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) কাজী নজরুল ইসলামের *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মৌলভী শামসুদ্দীন হুসেন, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, ৫ নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। ১৫ নং নয়ান চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা। বইটি মেটকাফ প্রেসে শ্রীমণিভূষণ মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, মূল্য: দুই আনা। তখন *সাম্যবাদী* প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সমাজের আকাশে একটি নতুন আলো ঝলকে ওঠে। আর এখন ২০২৫ সাল। অর্থাৎ, এ বছর *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের শতবর্ষ। আমরা মনে করি, এই শতবর্ষ পূর্তি কেবল একটি গ্রন্থের পুরানো হয়ে যাওয়াকে চিহ্নিত করে না, বরং এর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা এবং বিদ্রোহী কবির মানবতাবাদী দর্শনের বিজয়কে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, *সাম্যবাদী* কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যেখানে তিনি ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় তিনি সামাজিক ও মানবিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বজ্রের মতন কঠোর আওয়াজ তুলেছেন, যা আজও সকল শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সেইসব কবিতা থেকে উদ্ধৃতাংশ উল্লেখ করে আজও আমরা বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আড্ডা, মিছিল ও শোভাযাত্রায় উচ্চকিত হই। এমনকি গদ্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং গবেষণা কর্মে ব্যবহার করি।

'গাহি সাম্যের গান/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান। /যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিষ্টান।' (*সাম্যবাদী*)– এই কণ্ঠস্বর শুধু সাহিত্যিক উচ্চারণ নয়, এটা শোষিত মানুষের মুক্তির মন্ত্র। বলা বাহুল্য যে, বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম একজন বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, সংগীতকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক। তাঁর সাহিত্য জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী আদর্শ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, শ্রেণি-বৈষম্য ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি যে কাব্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবাদী উচ্চারণ করেছেন, তা কেবল বাংলা কাব্যে নয়; বিশ্ব সাহিত্যেও এক অভিনব দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

১৯২৫ সালে যখন কাজী নজরুল ইসলামের *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তখন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় জ্বলছিল। ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণির বিভাজন মানবসমাজে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল। মূলত বিশ্ব ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে নজরুলের *সাম্যবাদী* সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের দমননীতি, শ্রমিক-জনগণের উপর শোষণ, জমিদার ও মহাজনী প্রথার অত্যাচার ... এসবই তাঁর কবি সত্তাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব বিশ্ব রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক চেতনা ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শ ভারতবর্ষের তরুণ মেধাবীদের মধ্যে আলোড়ন তোলে। নজরুল সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে এসব খবর পড়তেন এবং প্রগতিশীল সাহিত্য-চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। এই প্রেক্ষাপটেই জন্ম নেয় সাম্যবাদী কবিতা এবং তৎপরবর্তীকালে একই নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ *সাম্যবাদী*। এতে তিনি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলেননি; বরং এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন এঁকেছিলেন; যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। মূলত এমন এক সময়ে নজরুল এই কাব্যগ্রন্থটি লিখেছেন; যা এক প্রবল ঝড়ের মতন। যা সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাই

বলা যায়, *সাম্যবাদী* কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবপ্রেম, মানবিকতা এবং বিশ্বজনীন ঐক্যের এক বিপ্লবী ইশতেহার। তাই *সাম্যবাদী*'র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই অমর সৃষ্টির গভীরতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থ নজরুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। এখানে অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলোতে তিনি সাম্য, স্বাধীনতা, বিদ্রোহ, মানবতা ও প্রলয়ের চেতনা মিশিয়ে এক অগ্নিগর্ভ কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন। এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এর প্রতিটি কবিতা প্রচলিত শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তির আহ্বান জানায়। মূলত শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চারতা, জমিদার-মহাজন, ধনী-গরিবের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ, রূপকল্প ও প্রতীক ব্যবহারে সাহসী ভঙ্গি, অগ্নি, ঝড়, প্রলয়, বজ্রপাত ইত্যাদি প্রতীক দিয়ে কবি বিপ্লবের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক চেতনা কেবল ভারতীয় সমাজ নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও সাম্যের ডাক এখানে প্রতিধ্বনিত। পাঠকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে কবির ভাষার শক্তি। ধারালো তলোয়ারের মতন খোলা, সাহসী ও তীক্ষ্ণ শব্দ চয়নে সাম্যবাদী কাব্যের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন এক একটি বজ্রনিনাদ। যে নিনাদে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে সমস্ত পাপ, মূলোৎপাটন হবে প্রতিটি অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচারের। *সাম্যবাদী* কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো, মানবতা ও সাম্যবাদ (হিউম্যানিজম)। নজরুলের এই সাম্যবাদ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের (যেমন: সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম) গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, বরং এটি বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে তুলে ধরেছে। তিনি অকপটে মানুষে মানুষে বৈরিতার প্রধান অস্ত্র ধর্মীয় সাম্যের কথা বলেছেন। কবি দেখিয়েছেন যে, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির, কাবা, গির্জা নেই। তাঁর কাছে সকল ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানের চেয়েও মানুষের আন্তরিক উপলব্ধি ও মানবতাবোধ শ্রেষ্ঠ। তাইতো তিনি সাম্যবাদী কবিতায় লিখেছেন,

> মিথ্যা শুনিনি ভাই,
> এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অদ্যাবধি নারীরা নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত অবহেলিত। যুগে যুগে নারীর প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে অনেক কবিরাই প্রতিবাদী হয়েছেন। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে নারীর পক্ষে উন্মুক্ত তরবারির মতন কলম ধরেছেন; তা বোধ হয় কেবল বাংলা সাহিত্য নয়; বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। নারী-পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম সোনার হরফে লেখা থাকবে। 'নারী' কবিতায় তিনি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানবসভ্যতা বিনির্মাণে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অবদান রয়েছে, তাই তারা একে অপরের পরিপূরক, প্রতিযোগী নয়। কবির ভাষায়,

> বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

শ্রেণি ও জাত-পাতের ভেদাভেদহীনতার বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আপোশহীন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান সকল মানুষকে একই মায়ের সন্তান হিসেবে দেখেছেন। তিনি জাতি-ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি 'মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক, মানুষেতেই সুরাসুর' এই দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ '*সাম্যবাদী*'র কবিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু আলোচনায় আনা যায়। কারণ *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো যেন এক একটি সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১১টি কবিতা রয়েছে। যেমন: সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য এবং কুলি-মজুর। প্রতিটি কবিতার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:

১. **সাম্যবাদী:** এই কবিতার মূল সুর হলো, মানবতার জয়গান এবং মানুষের হৃদয়ে সত্যের বসবাস। কবি ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই, কোনো ধর্ম, জাতি বা শাস্ত্রের ভেদাভেদ মানুষের মিলনকে আটকাতে পারে না। তিনি সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের মন্দিরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম উপাসনালয় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

২. **ঈশ্বর:** 'ঈশ্বর' কবিতায় কবি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজ হৃদয়ের অমৃত-হিয়াতেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে, কোনো মৃত পুঁথি-কঙ্কালে নয়। কবি মনে করেন, সব ধর্মের মূল কথা একই– মানবিকতা ও প্রেম, যা ঈশ্বরেরই স্বরূপ। মূলত কবি ঈশ্বরকে পুঁথি বা মন্দিরের কঙ্কালে না খুঁজে মানুষের হৃদয়ের অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে খুঁজতে বলেছেন।

৩. **মানুষ:** এই কবিতায় নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার মূল ভিত্তিটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে– মানুষই শ্রেষ্ঠ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। কবি দেখিয়েছেন, মানুষেতেই স্বর্গ-নরক এবং মানুষেই সুরাসুর। মূলত মানুষের মধ্যে থাকা দেবত্ব এবং পাশবিকতার দিক তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো তীর্থক্ষেত্র নেই।

৪. **পাপ:** 'পাপ' কবিতায় কবি সমাজে প্রচলিত পাপ-পুণ্যের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সমাজের দুর্বল ও লাঞ্ছিতদের উপর চাপানো মিথ্যা দোষারোপের নিন্দা করেন এবং দেখান যে, সমাজে সত্যিকারের পাপীরা হলো শোষক ও অত্যাচারীরা। পাপ-পুণ্যের বিচারের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫. **চোর-ডাকাত:** এই কবিতায় কবি সমাজের তথাকথিত চোর-ডাকাতদের মানবিক দিকটি তুলে ধরেছেন। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অনেক সময় দারিদ্র্য বা সামাজিক বঞ্চনার কারণে মানুষ অপরাধী হতে বাধ্য হয়। তিনি এই শ্রেণিকে ঘৃণা না করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

৬. **বারাঙ্গনা:** 'বারাঙ্গনা' (পতিতা) কবিতায় কবি সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত, অবহেলিত এই নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মানবিক দৃষ্টি প্রদান করেছেন। কবি বলেছেন, সমাজই এদের এই পথে ঠেলে দিয়েছে। তাই তাদের ঘৃণা না করে তাদেরও মানুষ হিসেবে সম্মান জানানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে সমাজের তথাকথিত পতিতা নারীদের প্রতিও মানবিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

৭. **মিথ্যাবাদী:** এই কবিতায় কবি সমাজের মিথ্যাচারী, শঠ ও প্রতারকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এদের মিথ্যাচার ও দ্বৈত আচরণের বিরুদ্ধে কবি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং সত্যের পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

৮. **নারী:** 'নারী' কবিতা নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী ঘোষণা। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন, পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকার রয়েছে। তিনি নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী বা দুর্বল হিসেবে না দেখে, সৃষ্টি ও কর্মে পুরুষের সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৯. **রাজা-প্রজা:** এই কবিতায় কবি ধনী-দরিদ্র ও শাসক-শাসিতের বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কবি শোষক রাজা-মহারাজাদের প্রতাপের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং খেটে খাওয়া প্রজাদের চিরন্তন গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন।

১০. **সাম্য:** 'সাম্য' কবিতায় কবি একটি আদর্শ সাম্যবাদী পৃথিবীর চিত্র এঁকেছেন, যেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, শ্রেণি– সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ হিসেবে সকলেই এক। এটি কবির চূড়ান্ত মানবতাবাদী আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

১১. **কুলি-মজুর:** 'কুলি-মজুর' কবিতাটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে নজরুলের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কবি সমাজে অবহেলিত কুলি-মজুরদের তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাদের শ্রমেই সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ তারাই সমাজে সবচেয়ে বঞ্চিত। তাদের প্রতি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। মূলত এই কবিতা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার এবং তাদের প্রতি সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের প্রধান কয়েকটি কবিতার কিছু প্রসিদ্ধ চরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমেই নাম ভূমিকার কবিতা 'সাম্যবাদী'। এই কবিতায় কবি শ্রেণি বৈষম্যহীন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি বলেন ধনী-গরিব, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শ্বেতাঙ্গ-কালো সব মানুষ সমান। কবির ভাষায় সাম্যের ঘোষণা এক ধরনের মানবিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কবিতায় তিনি ঘোষণা করেন, বর্ণ-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। তাঁর সাম্যের ডাক মানবতার সর্বজনীন মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। নজরুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঈশ্বর বা আল্লাহ কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা জাতির সম্পত্তি নন; তিনি সকল মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর কাছে ধর্ম হলো মানুষকে একত্রিত করার একটি মাধ্যম, বিভক্ত করার নয়।

'কুলি-মজুর' কবিতায় তিনি ধর্মের নামে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলেন এবং দেখান যে, শ্রমজীবী মানুষেরা সকল বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করে। নজরুল অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথাও তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সাম্যবাদী চেতনারই একটি অংশ। এখানে কবি শ্রমিক, কৃষক, নিপীড়িত জনতার দুর্দম শক্তির কাব্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দেন, শোষকের শৃঙ্খল ভেঙে তারা জেগে উঠবে এবং পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলবে।

তিনি বুঝিয়েছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যেও সাম্যের বীজ নিহিত আছে। তেমনিভাবে *সাম্যবাদী* কাব্যের 'রাজা-প্রজা' কবিতায় একই ভাবধারার আরো চমৎকার বিস্ফোরণ লক্ষ করা যায়। এসব সাযুজ্য কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য চেতনার বিষয়বস্তুর স্ফূরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আরও একটি চমৎকার বিষয় হলো যে, *অগ্নিবীণা* কাব্যের সঙ্গে সাম্যবাদীর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদিও *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থে সরাসরি *সাম্যবাদী* ঘোষণা নেই, তবু সেখানে বিদ্রোহ ও শোষণবিরোধী ভাষা *সাম্যবাদী* চেতনারই পূর্বরূপ। 'বিদ্রোহী' কবিতা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

মূলত *সাম্যবাদী* কাব্যের মূল ভিত্তি হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা। নজরুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো ধর্ম, কোনো গ্রন্থ বা কোনো প্রতিষ্ঠান মানুষের চেয়ে বড়ো নয়। কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা '*সাম্যবাদী*'তেই তিনি এই মূল সুরটি বাজিয়ে তুলেছেন: 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুলের এই ঘোষণা ছিল প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রতিবাদ। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষই হলো সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু এবং মানুষের কল্যাণই হওয়া উচিত সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য। তিনি 'মানুষ' কবিতায় বলেন, 'পূজিছে গ্রন্থ, পূজিছে মন্দির, পূজিছে দেবতা/ পূজিছে মানুষে মানুষ, পূজা সেথা।'

এই লাইনগুলোতে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি মূলত ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, তৎকালীন সময়ে যখন হিন্দু-মুসলিম বিভাজন চরমে পৌঁছেছিল, তখন নজরুল তাঁর কাব্যে এই বিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মন্দির-মসজিদ, কাবা-কাশী, বাইবেল-কোরান–এ সবকিছুই আসলে একই সত্যের দিকে নির্দেশ করে।

সাম্যবাদী কাব্যে নজরুল পাপ ও পুণ্যের প্রচলিত ধারণাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, মানুষকে ঘৃণা করা, অসম্মান করা বা বঞ্চিত করাই সবচেয়ে বড়ো পাপ। অপরদিকে মানুষকে ভালোবাসা, সাহায্য করা এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য।

নজরুলের সাম্যবাদী প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয় সমাজে প্রবল আলোড়ন ওঠে। অনেকে একে অতি বিপ্লবী ও বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অনেক কবিতা ও পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে। আবার প্রগতিশীল তরুণেরা তাঁকে যুগস্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথও নজরুলের প্রতিভার স্বীকৃতি দেন।

হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা কেবল রাজনৈতিক স্লোগান নয়, ছিল গভীর মানবতাবাদী আবেগে পূর্ণ। এ জন্যই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।' অন্যদিকে আবদুল মান্নান সৈয়দ মন্তব্য করেন, 'সাম্যবাদী নজরুলের সেই মুখ, যেখানে বিদ্রোহ ও মানবপ্রেম মিলেমিশে গেছে।'

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থটি শুধু বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, এটি একটি চিরন্তন মানবিক দলিল। শতবর্ষ পরেও এর বাণী বর্তমান সমাজে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আজও নজরুলের সাম্যের বাণী আজও আমাদের পথ দেখায়। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদের শেখায় যে, সত্যিকারের মুক্তি আসে মানুষের হৃদয়ে সাম্য ও ভালোবাসার বীজ বপনের মাধ্যমে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একটি শান্তিময় ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গড়তে হলে আমাদের সকল প্রকার বিভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হতে হবে। নজরুলের *সাম্যবাদী* কাব্য তাই কেবল অতীতের সাহিত্য নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্যও একটি উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা। *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থ নিয়ে যত বেশি আলোচনা হবে; মানুষের মাঝে সত্য, ন্যায়, সুন্দর এবং মানবতা বোধ ততো বেশি জাগ্রত হবে। অসত্য, অসুন্দর এবং অসাম্য সমাজ থেকে চিরতরে দূরীভূত হবে।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায়, *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হলেও, ২০২৫ সালে এসেও এর প্রাসঙ্গিকতা একবিন্দুও কমেনি। বরং, বর্তমান বিশ্বে যখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, লিঙ্গবৈষম্য, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য; ও পুঁজিবাদের গ্রাস বাড়ছে, তখন নজরুলের সাম্যবাদী দর্শন আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

নজরুলের কবিতা নতুন প্রজন্মকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং বৈষম্যহীন মানবসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখায়। এটি কেবল কাব্য নয়, এটি একটি জীবনদর্শন, যা মানুষকে তার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করতে শেখায়। *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের শতবর্ষপূর্তিতে তাই প্রয়োজন– কেবল অনুষ্ঠান আয়োজন নয়, বরং নজরুলের মানবতার এই মর্মবাণীকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। এই নতুন করে বার্তা মনে করিয়ে দেয় যে, সব ভেদাভেদ ভুলে মানুষই শ্রেষ্ঠ, আর মানবতাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।

এক শতাব্দী পেরিয়ে ও গেলেও *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থ আজও সমানভাবে তাজা এবং প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীর কোথাও যখন বৈষম্য, শোষণ, যুদ্ধ, ধর্মীয় বিভেদ চলমান, তখন নজরুলের আহ্বান আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। শতবর্ষ পরে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি– *সাম্যবাদী* কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, বরং বিশ্বমানবতার জয়গান।

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ: সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, jasimuddin7324@yahoo.com

জুলাই শহিদ পরিবার এককালীন ৩০ লাখ টাকা ও মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা পাবেন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের 'জুলাই শহিদ' ও আহতদের 'জুলাইযোদ্ধা' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। শহিদ পরিবার এককালীন ৩০ লাখ টাকা এবং মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা পাবেন। উপদেষ্টা ২১শে জুলাই বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে জুলাই গণ-অভুত্থ্যানের জুলাই যোদ্ধা ও জুলাই শহিদ পরিবারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ক এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ইতোমধ্যে জুলাইয়ের ৮৪৪ জন জুলাই শহিদদের তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। শহিদ হওয়ায় প্রত্যেকটি শহিদ পরিবার এককালীন ৩০ লাখ টাকা অনুদান পাবে। এর মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৭৭২টি শহিদ পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ১০ লাখ টাকা করে মোট ৭৭ কোটি ২০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রতি শহিদ পরিবারের অবশিষ্ট ২০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুলাই মাস হতে প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট ৭২টি শহিদ পরিবারের মধ্যে পরিবারিক ও ওয়ারিসগত জটিলতা নিরসন করে সঞ্চয়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জুলাই যোদ্ধারা ক্যাটেগরি 'এ', ক্যাটেগরি 'বি' ও ক্যাটেগরি 'সি' অনুযায়ী সুবিধা পাবেন। ক্যাটেগরি 'এ' জুলাই যোদ্ধাগণ এককালীন নগদ ৫ লাখ টাকা অনুদান পাবেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নগদ ২ লাখ টাকা করে ৪৯৩ জন জুলাই যোদ্ধাকে মোট ৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ লাখ টাকা ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে প্রদান করা হবে। 'বি' ক্যাটেগরি জুলাই যোদ্ধাগণ এককালীন ৩ লাখ টাকা অনুদান পাবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নগদ ১ লাখ টাকা করে ৯০৮ জনকে মোট ৯ কোটি ৮ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২ লাখ টাকা ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে প্রদান করা হবে। 'সি' ক্যাটেগরির জুলাই যোদ্ধারা ১ লাখ টাকা অনুদান পাবেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১ লাখ টাকা করে ১০ হাজার ৬৪২ জনকে মোট ১০৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আহত জুলাই যোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা, শহিদ পরিবারের অনুকূলে সঞ্চয়পত্র এবং আহতদের অনুকূলে এককালীন অনুদান বাবদ ২৫৯ কোটি ৬৮ লাখ ৪ হাজার ২১২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

নজরুল, বাঙালি পল্টন এবং ঢাকা প্রসঙ্গ

অনুপম হায়াৎ

ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্লাটুন' বাংলায় তাকে বলে পল্টন। 'প্লাটুন' শব্দের অর্থ সৈন্যদল, পদাতিক বা সৈন্যবাহিনীর অংশ। কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেই প্লাটুন বা পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) সময়। তবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন 'বাঙালি পল্টনে'। 'বাঙালি পল্টনে' আরও অনেক বাঙালি হিন্দু-মুসলমানও যোগ দিয়েছিলেন সৈনিক হয়ে। 'প্লাটুন' শব্দটি কখন, কীভাবে কোন সময়ে বাঙালিদের কাছে 'পল্টন' হয়ে গেল তা নিয়ে বোধ হয় থিসিস হতে পারে।

১৭৫৭-এর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর লর্ড ক্লাইভের সময় ভারতীয় সেনাদের নিয়ে 'লাল পল্টন' গঠন করা হয়েছিল। আর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সময় বাঙালিদের জন্য যে সেনাদল গঠন করা হয়েছিল তা পরিচিতি পায় 'বাঙালি পল্টন' হিসেবে। কাজী নজরুল ইসলামের পল্টন জীবন নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন সেসব জানার ব্যাপারে। আমি বাঙালি পল্টন ও ঢাকার ব্যাপারে প্রায় অজানা বা অনুদ্ধারিত কিছু তথ্যের উল্লেখ করতে চাই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে। আর অপরদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে জার্মানি। ব্রিটেন ১৯১৪-এর আগস্টের প্রথম দিকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময় থেকে ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ ভারতের বাঙালিরাও নানানভাবে ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করতে থাকে। সাহায্যের পাশাপাশি বাঙালিরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের দাবি জানায়। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল প্রথমে বেঙ্গলি ডলান্টিং ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স কোর ও দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি' গঠন করে এবং পরে লর্ড রোনাল্ডসে তৃতীয় পর্যায়ে 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' ও চতুর্থ পর্যায়ে 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্স বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি' গঠন করে বাঙালিদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালিরা 'বাঙালি পল্টন'-এর সৈনিক হিসেবে পরিচিতি পায়। পল্টনের একটি অংশের নাম হয় '৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন'। করাচিতে ছিল এর ছাউনি। কাজী নজরুল ইসলাম এই ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে ছিলেন। ইংরেজিতে ফোরটি নাইনথ ব্যাটেলিয়ান।

নজরুল-বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় বাঙালি পল্টনে নজরুলের ভর্তি প্রসঙ্গ রয়েছে। এই বাঙালি পল্টন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুজফফর আহমদ লিখেছেন, "যে নজরুল 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'তে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকের হয়ত জানা নেই যে, এই 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি' গঠনের আনুষ্ঠানিকতা অনুমোদনের ঘোষণাটি পূর্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর ঢাকা থেকেই দেওয়া হয়েছিল। ঢাকায় তখন চলছিল বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশন। বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট এই অধিবেশনে 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি' গঠনের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণার পরপরই কয়েক দিনের মধ্যে লোক ভর্তি হতে শুরু করে।"

ডাবল কোম্পানি গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৫০ জনের। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ২২৮ জনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'। এরপর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের জুনে 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' গঠনের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়। যাই হোক 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি' গঠনের 'ঢাকা ঘোষণা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯১৬-এর মে মাসে ঢাকার বিক্রমপুরের নয়ানগরের বাসিন্দা অবনীমোহন বসু ব্রিটিশ বাহিনীতে লে. হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে রাওয়ালপিন্ডির দায়িত্ব নেন। এই সময় 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'র সৈন্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ফরিদপুর-ঢাকার অম্বিকারচরণ মজুমদার। তার কাছে নওশেরায় প্রশিক্ষণরত বাঙালি সৈনিকদের কেউ কেউ চিঠিপত্রও পাঠাতো। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকাবাসীরা ব্রিটিশ সরকারকে দুটি অ্যাম্বুলেন্স, মোটর, লঞ্চ উপহার হিসেবে প্রদান করে। এর মধ্যে একটির নাম 'ঢাকেশ্বরী'।

এপ্রিল মাসে ঢাকার পৌরসভার কমিশনার প্রসন্ন সাহা 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া ফোর্সে' যোগদানের ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। পরে তাঁর বাড়িতে বাঙালি সৈনিকদের ছবিও তোলা হয়। মে মাসে ঢাকায় বসবাসরত অন্যান্য ভারতীয় যুদ্ধে সহায়তার জন্য মোটর, অ্যাম্বুলেন্স, লঞ্চ দান করেন। এ মাসেই ঢাকায় নবাব হাবিবুল্লাহ 'বেঙ্গলি রেজিমেন্টে' যোগ দেন নায়েব হিসেবে। এর আগে তাঁর পিতা নবাব সলিমুল্লাহ ইন্ডিয়ান ওয়্যার রিলিফ ফান্ডের বঙ্গীয় শাখার সদস্য হয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকার বিক্রমপুরে আরও একজন যোগ দেন সৈনিক হিসেবে। তিনি করাচিতে নজরুলের রুমমেট ছিলেন। আর বাঙালি পল্টনের হাবিলদার বাংলা সাহিত্যাকাশের বিদ্রোহী ধূমকেতু কাজী নজরুল ইসলামের শেষ শয্যা রয়েছে ঢাকার মাটিতেই। এখানেই পল্টানি কায়দায় তাঁকে জানানো হয়েছে শেষ বিদায় মার্চ-পাস্টের সুরে।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরই রচিত 'চল্ চল্ চল্' গানটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'রণসংগীত' হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

অনুপম হায়াৎ: লেখক ও গবেষক

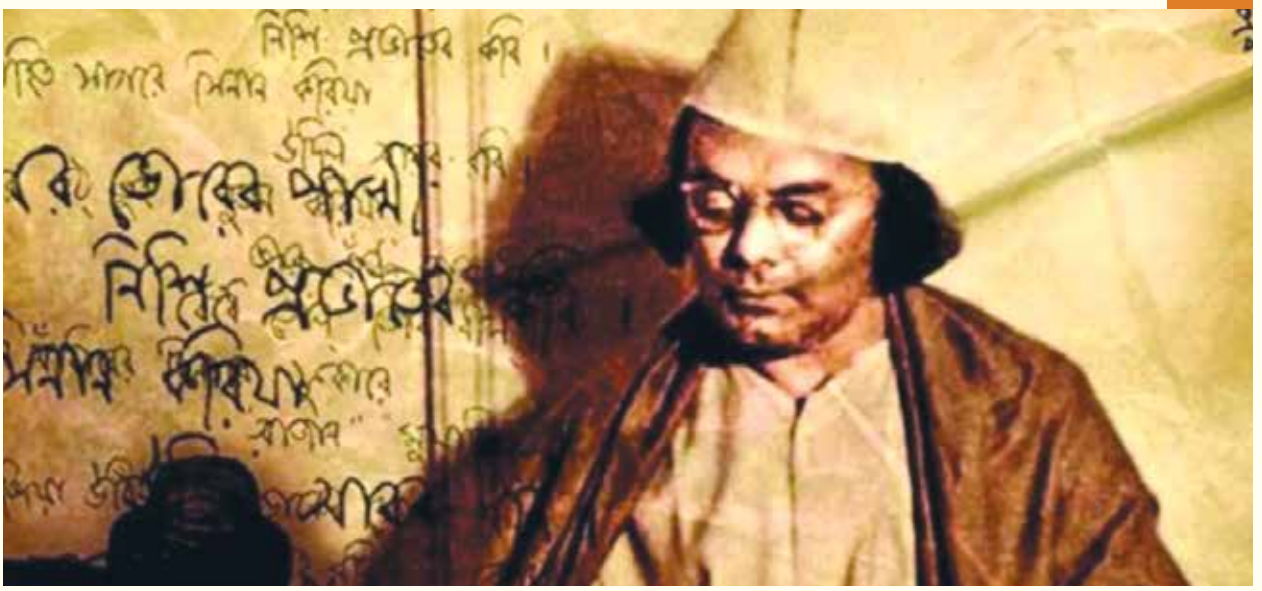

নজরুলের স্বদেশি গান: চেতনায় অনির্বাণ জাগরণ

আলী হাসান

বিশ্ব সংগীতের ইতিহাসে সুর ও বাণীর এক মহান অমিয় বরপুত্রের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের গানের বাণী ও সুর-বৈচিত্র্যের যে গভীর ও উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই আমাদের সামনে আসে তা এক কথায় অনির্বচনীয়। বৈচিত্র্যের মানদণ্ডে নজরুল সংগীতের কথা যেমন উচ্চমানসম্পন্ন বিষয় ও ভাবরস নির্ভর; তেমনি সুরও প্রাচ্যদেশীয় অগুনতি রাগ-বৈচিত্র্যের এক গভীর লীলাখেলার নির্মল নির্যাস। অতিশয় প্রান্তিক গ্রামীণ জীবনের চাষাভুসার গেয়ো জীবনভিত্তিক সংগীত রচনা থেকে শুরু করে বাংলা সংগীতের বহু বৈচিত্র্যশীল পথ-মাঠ-ঘাট পেরিয়ে উচ্চশিক্ষিত, সংগীতানুরাগী ও সুধী সমাজে স্বীকৃত সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাবানদের সংগীতায়োজনের জন্য উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনা– সর্বক্ষেত্রেই নজরুল বিষয়ভিত্তিক কথা ও সুরের অগণিত সাংগীতিক রুট সৃষ্টি করেছেন অবলীলায়। সংগীতেরও যে এত অধিকসংখ্যক শাখা-প্রশাখা-উপশাখা ও সুর-বৈচিত্র্যর অফুরন্ত অলিগলি থাকতে পারে, তা নজরুল রচিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার সংগীত (মতান্তরে পাঁচ হাজারেরও অধিক) ছাড়া বাংলা সংগীত নয় শুধু, বিশ্ব সংগীতেরও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা জানি, গান মানবমনের এক অতিউচ্চ উৎকর্ষজাত সর্বজনীন বিষয় এবং তা সর্বদেশকালের ঊর্ধ্বে। এই কথাটি আমলে নিয়েও অবলীলায় বলা যায়– নজরুলের গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্ব সংগীতের বিচার্যেও বহু বিচিত্রতায় বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। তাঁর বিপুল পরিমাণ গানের মধ্যে এখনো অনেক গান অনাবিষ্কৃত রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সেই কৈশোরবেলায় লেটোর দলকে কেন্দ্র করে নজরুলের মধ্যে সংগীত প্রতিভার যে বিস্ফোরণ ঘটে তাই মূলত পরবর্তীতে সার্থক পরিণতি লাভ করে। সেখানে লেটোর দলে পালা রচনা করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি নিয়েই তাঁকে গান লিখতে হতো এবং বলা যায়, সেখান থেকেই তাঁর একইসঙ্গে ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনারও জন্ম হয় এবং তা বিকাশ ও পরিপুষ্টি লাভ করে।

একদিকে তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও জীবনধারা থেকে তার গানের উপাদান বেছে নিয়েছেন; অন্যদিকে হিন্দু ঐতিহ্যের পৌরাণিক কাহিনি থেকেও প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের নির্বিঘ্ন সহাবস্থানের অবয়বটি এভাবেই নজরুল তাঁর সংগীত ও সাহিত্যে স্থায়ীরূপ দান করেন। নজরুলের গানের অন্তর্গত ভাব, সজীবতা ও সহজবোধ্যতা শুরু থেকেই বাংলা গানে একটি নতুন মাত্রা এনেছে। একইসঙ্গে একদিকে গানের কথা, ভাব ও সুরের তাৎপর্যপূর্ণ সমুন্নতি, অন্যদিকে সেই গানগুলোর সমকালীন তুমুল জনপ্রিয়তা– এসবকিছু মিলে সেসময়ের গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো দারুণ ব্যবসাসফল হয়ে ওঠেছিল শুধু নজরুলের গান রেকর্ড ও বিপণন করে।

নজরুলের বহু বিচিত্র সংগীতধারার মধ্যে দেশাত্মবোধক জাগরণীমূলক গান এক অনন্য উচ্চতায় সমাসীন এবং বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীতধারায় তাঁর এই অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। সমকালীন ইংরেজ শাসকদের দুঃশাসন ও নানা অনাচারের বিরুদ্ধে রচিত তাঁর দেশাত্মবোধক জাগরণীমূলক গানগুলো সে সময়ের প্রেক্ষাপটে যেমন বিপুল বৈচিত্র্য ও প্রাণস্পর্শী গভীরতায় পরম আদরে তখন গ্রহণীয় হয়েছে, পরবর্তীকালেও তা সংগীতের রসপিপাসু বাংলা

ভাষী সকল শ্রেণির মানুষ এবং দেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতাদের সংগীত রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। বিষয়, প্রেক্ষাপট, ভাষা, ভাব, সুর ও ছন্দে নজরুল তাঁর দেশাত্মবোধক গানের ডালাকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন এবং এমন উচ্চতায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন যে তা শুধু তাঁর সমকালীনতার প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার চাহিদাকেই পূরণ করতে সক্ষম হননি– চিরকালীন মানবের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবকেও স্থায়ীরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'নজরুলগীতি অখণ্ড' এবং নজরুল রচিত সংগীতের অন্য গ্রন্থগুলোতে মোট ১১৫টি দেশাত্মবোধক গানের সন্ধান আমরা পাই।

নজরুলের সংগীত ভাণ্ডারের যে বৈচিত্র্যতা এই নিবন্ধে উল্লিখিত হলো– আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বৈচিত্র্যময় এসব সংগীত-অঙ্গেরও রয়েছে আবার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গসমূহ। যেমন দেশাত্মবোধক গানকে কমপক্ষে ৭টি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব।

১. দেশবন্দনামূলক গান
২. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান
৩. শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান
৪. নারী জাগরণমূলক গান
৫. মুসলিম জাগরণমূলক গান
৬. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গীতি
৭. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশাত্মবোধক গানের যতগুলো প্রশাখার কথা উল্লিখিত হলো তার মধ্যে নজরুল প্রতিভার সর্বোচ্চ বিস্ফোরণ ঘটেছে তাঁর রচিত সংগ্রামমূলক গানগুলোতে। তবে সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণমূলক গান ও দেশভক্তিমূলক গান রচনায়ও তাঁর সাফল্য সর্বোচ্চ পর্যায়েই বলে প্রমাণিত। 'নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম', 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়', 'শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের', 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি' ইত্যাদি কালজয়ী গানগুলো বহুকাল ধরে বাঙালির চেতনায় অমলিন আসন গেড়ে বসে রয়েছে। নজরুল নিজে একজন অকুতোভয় সংগ্রামী সৈনিক ও স্বাধীনতার আপোশহীন সংগ্রামী কর্মী হওয়ার দরুন তাঁর রচিত সংগ্রামমূলক গানগুলো বাংলা গানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল জায়গা লাভ করেছে। ভারতবর্ষকে বিদেশি ইংরেজ শাসনের কড়ালগ্রাসমুক্ত করার সংগ্রামকে তিনি এক পবিত্র কর্তব্যজ্ঞান মনে করেছিলেন। নজরুল সাহিত্যের অন্যান্য রচনাও ছিল সংগ্রামী মানুষের প্রেরণার সর্বজনীন উৎসস্বরূপ। পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুল রচিত যে সমস্ত সংগ্রামমূলক গান আমরা পাই তার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের সামগ্রিক মানসরূপটিই প্রত্যক্ষ করি। সংগ্রামমূলক এসব গানের মধ্যে কিছু গানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে; আর কিছু গানে জেলজুলুম ও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট', 'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে', 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'অগ্র পথিক হে সেনাদল' ইত্যাদি সংগ্রামী ও জাগরণমূলক কালোত্তীর্ণ গানগুলো পরাধীনতার বিরুদ্ধে আজন্ম সংগ্রামমুখর মানুষের চিরকালীন উদ্দীপনার উৎস হিসেবে আজও কাজ করে। সংগীতের যে

সুগভীর বোধ নজরুলের মধ্যে ছিল তারই প্রেরণায় তিনি এইসব সহজ বাণীবন্ধের অন্তর্নিহিত সংগীতকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। এই গানগুলো কথা ও সুরের আপন জগৎ থেকে আপনিই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত এক নিরন্তর প্রেরণা যেন কোনো উচ্চতর সংগীতায়োজনের সাথে এর যুক্ত হবার কোনোই প্রয়োজনীয়তাবোধ করেনি। প্রথমদিকে নজরুল রচিত অনেক দেশাত্মবোধক গানই হতো বেশ দীর্ঘ– যেখানে গানের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে স্তবক বিভাজনের পদ্ধতিকেও মানা হয়নি। এর কারণ, এই গানগুলো তৈরি করা হতো যেহেতু সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। সংগত কারণেই এগুলো দীর্ঘক্ষণ ধরে গাইতে হতো– বিধায়, এই পর্বের গানগুলো দৈর্ঘ্যে একটু বড়ো হতো। এরপর নজরুল যখন সংগীত রচনায় আরও অনেক বেশি পরিণত এবং যে সময়টাতে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে সার্বক্ষণিকভাবে যোগ দিয়েছেন তখনকার দেশাত্মবোধক গানগুলো সংগীতের সাধারণ স্তবক বিভাজন মেনে প্রমিতাকারেই তৈরি করতেন। তবে নজরুল রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলো সভাসমাবেশের জন্য লেখা হোক অথবা দেশমাতৃকার প্রেমে অবগাহন করে লেখা হোক অথবা সর্বাত্মক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই লেখা হোক– এই বিষয়ের সকল গানই একটি বিশেষ সময়কে ও স্বরাজ আন্দোলনের বিশেষ পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করে লেখা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো– নজরুলের এই কালজয়ী দেশাত্মবোধক সংগ্রামী গানগুলো এমনি-এমনিই সৃষ্টি হয়নি, এই সৃষ্টি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেতনাজাত স্বতঃস্ফূর্ততার বহিঃপ্রকাশ। ব্রিটিশবিরোধী স্বরাজ আন্দোলনের সভায়, মিছিলে-মিটিংয়ে নিয়মিত অংশগ্রহণ, কারান্তরীণ অবস্থায় যাপিত জীবনে নানাভাবে অত্যাচারিত হওয়া এবং দিনের পর দিন অনশন পালন করার মধ্যদিয়ে যে যাতনাভোগ ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটেছে এসব গানে। নজরুল গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সংগ্রাম গড়ে তোলার শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনের প্রেরণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে শিল্প-সাহিত্যের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রণোদনার মাধ্যমেই। কেননা, এর মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায় ও জাগিয়ে তোলা যায়। নজরুল যা মনপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তাই বাস্তবে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হতেন সব সময়। নজরুল তাঁর রচিত সংগ্রামী সংগীতগুলো দিয়ে একদিকে যেমন বিরাট শক্তিশালী সশস্ত্র ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অদৃশ্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন ঠিক একইভাবে সে সময়ে এক ধরনের প্রাদুর্ভাব হিসেবে চিহ্নিত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সমাজ বাস্তবতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক ঢাল হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, চেতনায় উজ্জীবিত মানবতাবাদের এই অদৃশ্য অস্ত্র তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন।

এটা সকলেরই জানা যে, নজরুলের শিল্প-সাহিত্যের সৃজনশীল সক্রিয় জীবন, অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর নিষ্ক্রিয় জীবনের তুলনায় নেহাতই কম। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যাপিত জীবনে সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় সদম্ভ পদচারণার পাশাপাশি সুরসাধনাসহ নজরুল এত বিপুল সংখ্যক গান কী করে রচনা করলেন সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার– যা এক অসাধারণ শিল্পবৈচিত্র্যেও সমুন্নতিপ্রাপ্ত। নজরুল মূলত গানেরই মানুষ, তাই মানুষের জন্য তাঁর রচিত গানগুলোই হয়েছে তাঁর নিজস্ব পরিচয়ের মূল নিয়ামক। তিনি প্রসঙ্গ পেলেই বলে উঠতেন– 'সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি জানি না, তবে সংগীতে যা দিয়েছি– তা আজ মূল্যায়িত না হলেও একদিন এর মূল্যায়ন ঠিকই হবে।'

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিজের জীবন ও বিপুল কর্মযজ্ঞের গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারণ দিবালোকের মতোই সত্য ও বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশ্বজুড়ে সকল বাংলাভাষী মানুষ আজ নয় শুধু, অনন্তকাল ধরে নজরুল রচিত বাংলা সংগীতের বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাণ্ডারের মানবিক মূল্যবোধের উচ্চাঙ্গিক আবেদন ও শিল্পঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

আলী হাসান: লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী

বন্ধু শাশ্বত এক বিশ্বস্ত সারথি

ড. সবুজ শামীম আহসান

বন্ধু বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পবিত্র এক সম্পর্কের নাম। বন্ধু ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ। জীবনে-মরণে, সুখে ও দুঃখে বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বন্ধু দুটি দেহের একটি প্রাণ। আমরা সবকিছু ছাড়তে পারি শুধু বন্ধুকে ভুলতে পারি না। বন্ধু বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা প্রাকৃতিক নিয়মে যে যার জায়গায় চলে গেলেও বন্ধুরা ছেড়ে যায় না। বিপদে বন্ধুরাই পাশে থাকে। বন্ধু তিনটি বর্ণের একটি শব্দ হলেও এর গভীরতা অসীম। এ শব্দের মাঝে মিশে আছে পৃথিবীর সকল পবিত্রতা এবং মায়া-মমতার ছায়া। নির্ভরতার বিশ্বস্ত নাম হচ্ছে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব এমন একটি বন্ধন যাতে থাকে স্বার্থহীন ও শর্তহীন ভালোবাসা[১]।

বন্ধুত্ব বলতে একে অপরের পারস্পরিক সখ্য ও মিত্রতাকে বলা হয়েছে[২]। সৃষ্টিকর্তার এক মহান অনুগ্রহের নাম বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের কোনো রং নেই, তবুও সে রঙিন। বন্ধুত্বের কোনো আকার নেই, তবুও সে সুন্দর। বন্ধুত্বের কোনো ঘর নেই বন্ধুর হৃদয়ই তার ঘর। প্রকৃত বন্ধু হয় না কখনই পর। তাইতো যে কথা বাবা-মা, ভাই-বোন এমনকি স্বামী-স্ত্রীকেও বলা যায় না তা কেবল বন্ধুকেই বলা যায়।

বন্ধু মানে দুটি হৃদয়ের টান
বন্ধু মানে ভালোবাসা আর একটু অভিমান
বন্ধু মানে দুটি জীবন আর একটি প্রাণ।

আধুনিক বাংলা অভিধানের মতে, বন্ধু মানে সখা, সুহৃদ, হিতৈষী, স্বজন বা প্রিয়জনকেই বুঝায়[৩]। বন্ধুত্বের সম্পর্ক এক মানুষকে আরেকজনের সাথে মনের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সম্পর্ক অনেক ধরনের হয় কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্কই সবচেয়ে মহৎ। বন্ধুত্বে রক্তের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। হেলেন কিলারের মতে, 'একজন বিশ্বস্ত বন্ধু দশ হাজার আত্মীয়ের সমান। তবে বন্ধু পাওয়া যতটা কঠিন বলা যায়, বন্ধুত্ব রক্ষা করা তার চেয়েও বেশি কঠিন[৪]।' বন্ধুত্ব হলো সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদগুলোর মধ্যে একটি যা সবার ভাগ্যে জোটে না। বন্ধুত্বের ধারণাটি খুব গভীর সম্পর্কের একটি ছোটো সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বন্ধুত্বের অনেক রূপ আছে। শুধু মানুষে মানুষেই বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব গাছপালা, পশুপাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর সাথেও হয়ে থাকে। বন্ধুত্বই মানুষকে আশার আলো দেখায়। তবে ফেসবুকের বন্ধু আর আমাদের ঐতিহ্যের বন্ধু এক নয়। বন্ধু– এ শব্দের মধ্যে মিশে আছে পৃথিবীর সব নির্ভরতা[৫]। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। আমাদের জীবন বন্ধু ছাড়া অপূর্ণ বলে মনে হয়। আত্মার শক্তিশালী বন্ধনের নাম বন্ধুত্ব। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবান তারাই যাদের প্রকৃত বন্ধু নেই'। দুঃসময়ে পৃথিবীর সব মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিলেও প্রকৃত বন্ধু পাশেই থাকে। একজন বন্ধুই তার কোমল হাতের পরশে বন্ধুর সব বেদনা মুছিয়ে দেয়। কারণ বন্ধুত্ব মানুষের মধ্যকার একটি

পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক। আর এ সম্পর্ক সহপাঠী, প্রতিবেশী, সহকর্মীর চেয়ে আন্তঃব্যক্তিক বন্ধনের একটি শক্তিশালী রূপ[৬]। যে গোপনে দোষ ধরিয়ে দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু আর যে সামনে প্রশংসা করে সে তোমার শত্রু। গবেষকদের মতে, প্রতি ১২ জন বন্ধুর মধ্যে একজন পরম বন্ধু হয়। তাই জেনেশুনে বন্ধুত্ব করা উচিত। বন্ধু চিনতে ভুল করলে জীবনে অনেক সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

বন্ধুত্ব কোনো বয়স মানে না। ভৌগোলিক সীমারেখা মেনে বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বিধিবিধানও মানে না। বন্ধুত্ব যে-কোনো বয়সের যে-কোনো ধর্মের বা গোত্রের মানুষের সাথে হতে পারে। বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, কাছে কী দূরে তা বিবেচনায় আনা হয় না। মোট কথা বন্ধুর কোনো জাত নেই। এক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখযোগ্য–

আমার কিছু বন্ধু আছে।
ভালো-মন্দ পাঁচমিশালি
নানারকম খামখেয়ালি
রোগা-মোটা অসীমবল
আমার কিছু বন্ধু আছে।

বন্ধু সবচেয়ে শ্রুতিমধুর একটি শব্দ। বন্ধু মানেই বিশ্বাস, বন্ধু মানেই ভালোবাসা। বন্ধুর অনেক নাম আছে। বন্ধুকে গ্রামাঞ্চলে বলে সই, রবীন্দ্রনাথ সখী, জসীমউদ্‌দীন ভোমর আর নজরুল ইসলাম বলেছেন প্রিয়া। নিতান্তই ছোটো শব্দ বন্ধুকে নিয়ে কত ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, উপাখ্যান ও গান রচিত হয়েছে। যেমন–

একবুক জ্বালা নিয়ে বন্ধু তুমি কেন একা বয়ে বেড়াও
আমায় যদি তুমি বন্ধু মানো কিছু জ্বালা আমায় দাও।

'বন্ধু জীবনদানকারী ঔষধের চেয়েও ভালো হয় কারণ ভালো বন্ধুত্বের কোনো এক্সপায়েরি ডেট হয় না'। জীবনে দুই ধরনের বন্ধু থাকা জরুরি প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের মতো বন্ধু যে পাশে থেকে যুদ্ধ জয় করতে তোমাকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, কর্ণের মতো বন্ধু যে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও কখনো তোমাকে একলা ছেড়ে যাবে না। এখানে চার্লি চ্যাপলিনের কথা বলা দরকার। তার মতে, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হলো আয়না কারণ আমি যখন কাঁদি তখন সে হাসে না। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে বন্ধু ছাড়া বাঁচতে পারে না। বাঙালি বন্ধুর স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা চিরন্তর ও শাশ্বত।

বন্ধু তোমার পথের সাথিকে চিনে নিও
মনের মাঝেতে চিরদিন তাকে ডেকে নিও।

বন্ধুত্ব আটপৌরে, ভালোবাসা পোশাকি। বন্ধুত্বের আটপৌরে কাপড়ে দুই এক জায়গায় ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও হানি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল। কিন্তু ভালোবাসার

পোশাক একটুও ছেঁড়া থাকিবে না, ময়লা হইবে না, পরিপাটি হইবে। বন্ধুত্ব নাড়াচাড়া, টানাছেঁড়া সয় কিন্তু ভালোবাসা তাহা সয় না[৭]।

মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করতে ভালো বইয়ের সাথে ভালো বন্ধুত্বও প্রয়োজন। মানুষ প্রতারণা করতে পারে কিন্তু বই বা ভালো বন্ধু কখনই প্রতারণা করে না। এখানে ড. এপিজে আব্দুল কালামের মতামত উল্লেখযোগ্য তিনি বলেছেন, 'একটি বই একশোটি বন্ধুর সমান কিন্তু একজন ভালো বন্ধু পুরো একটি লাইব্রেরির সমান'। বন্ধুত্ব হতে হবে ভালো মানুষের সাথে; ভালো বইয়ের সাথে। তবেই জীবন হবে মধুময় ও সুখময়।

বন্ধু দিবসের শুরুটা ১৯১৯ সালে কার্ড কোম্পানি হলমার্কের হাত ধরে[৮]। তবে বন্ধুত্ব দিবস বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে পালন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২০শে জুলাই বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসের প্রথম প্রস্তাব করেন ড. অ্যার্টেমিও ব্র্যাচো। ২০১১ সালের ২৭শে এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৩০শে জুলাই অফিসিয়ালি বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস ঘোষিত হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সাল থেকেই বন্ধু দিবস পালনের প্রথা চলে আসছে আমেরিকাতে। জানা যায় ১৯৩৫ সালে আমেরিকার সরকার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে[৯]। আর ঐ দিনটি ছিল আগস্টের প্রথম শনিবার। তার প্রতিবাদে পরের দিন ঐ ব্যক্তির এক বন্ধু আত্মহত্যা করেন। এর পরেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে বন্ধুদের অবদান আর তাদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই আমেরিকান কংগ্রেসে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম রবিবারকে বন্ধু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে সারা বিশ্বে আগস্টের প্রথম রবিবারেই বিশ্ব বন্ধু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারতসহ এশিয়ার দেশগুলোতে আগস্টের প্রথম রবিবার বন্ধু দিবস পালিত হয়। আবার কোনো কোনো দেশে ৮ই এপ্রিল বন্ধু দিবস হিসেবে পালন করা হয়[১০]। বন্ধু দিবসে বন্ধুরা একে অপরকে ফুল, কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার দিয়ে ভালোবাসার স্বরলিপিতে পৃথিবীর দশদিকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে।

বন্ধু দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা বিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্ব উপভোগ করা। আগের বন্ধুকে আগলে রেখে নতুন বন্ধুকে বরণ করে নেওয়া। আনন্দ-উৎসবে দিনটিকে স্মরণীয় করা। সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাও বন্ধু দিবসের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নিম্নে বন্ধু দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো:

১. পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন;
২. বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ;
৩. পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো;
৪. নিজ নিজ দেশকে বিশ্বময় করা;
৫. বিভিন্ন ভাষার আদান-প্রদান করা;
৬. সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি করা;
৭. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
৮. সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
৯. সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা;
১০. প্রাণ খুলে হাসি ও কথা বলা প্রভৃতি।

বন্ধু দিবসের তাৎপর্য হলো বন্ধুদের সহযোগিতায় পৃথিবীর মানুষকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার সুতোয় বেঁধে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সকল বন্ধুদের পারস্পরিক সংস্কৃতির ছোঁয়ায় সুন্দর পৃথিবী গড়া। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে এক বৈষম্যমূলক সমাজ বিনির্মাণ করা। নিম্নে বন্ধু দিবসের গুরুত্বের বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো;
২. বিশ্বস্ততা;
৩. একাকিত্ব দূরীকরণ;
৪. সামাজিকীকরণ;
৫. সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ;
৬. আবেগের বহিঃপ্রকাশ;
৭. কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি;
৮. পরমতসহিষ্ণুতা;
৯. সততা ও স্বচ্ছতার বিকাশ;
১০. ক্ষমাশীলতা;
১১. সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;
১২. জীবনকে এগিয়ে নিতে;
১৩. জীবনের পরিপূর্ণতা;
১৪. অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ;
১৫. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রভৃতি।

সবশেষে বলা যায়, বন্ধু এক নির্মল সম্পর্কের নাম এবং এক অসাম্প্রদায়িক চেতনারও প্রত্যয়। পৃথিবীর সব সম্পর্কের ভিত্তি হলো বন্ধুত্ব। সব সমস্যার সমাধানকারীর নাম বন্ধু। এ সম্পর্কের কারণেই একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয় অবলীলায়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক এক মানুষকে আরেকজনের সাথে মনের বন্ধনে আবদ্ধ করে। বন্ধু এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের প্রতীক। সকলে ছেড়ে গেলেও প্রকৃত বন্ধু কখনো ছেড়ে যায় না। বিপদে কেবল বন্ধুই পাশে থাকে। বন্ধুত্বের এ প্রগাঢ় বাঁধন মানসিক সম্পর্কের এমনই জটিল জাল যা ছেঁড়ার নয়।

তথ্যসূত্র

১. মো. সহিদুল ইসলাম, বন্ধু দিবসের প্রবন্ধ, ব্লগ, কিশোরগঞ্জ.কম, ১১ই আগস্ট ২০১৪।
২. জামিল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯১৭।
৩. পূর্বোক্ত, জামিল চৌধুরী (সম্পাদিত),
৪. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *শামসুর রাহমান ও বন্ধুত্ব*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ভূমিকা।
৫. দৈনিক *কালবেলা*, ঢাকা, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪।
৬. সিএন.উইকিপিডিয়া.ওআরজি।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা।
৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩০শে জুলাই ২০২৩।
৯. দৈনিক *সোনার দেশ*, ঢাকা, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪।
১০. বিএন. উইকিপিডিয়া.ওআরজি।

ড. সবুজ শামীম আহসান: লেখক, শিল্পী, সংগঠক ও সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, যশোর সিটি কলেজ, jgccsocialwork@gmail.com

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রমিক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭-এর আপগ্রেডেড ভার্সন উদ্বোধন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফ) শ্রম বিষয়ক হেল্পলাইনের ১৬৩৫৭ আপগ্রেডেড ভার্সন ২রা জুলাই উদ্বোধন করা হয়। রাজধানীর শ্রম ভবনে এ সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এএইচএম সফিকুজ্জামান।

শ্রম সচিব বলেন, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় এ আপগ্রেডেড হেল্পলাইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আওতায় গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে ৬,১৯৬টি অভিযোগ প্রাপ্তির মধ্যে ৪,৮৩৮টি সফলভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। শ্রম বিষয়ক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ -এর আপগ্রেডেড ভার্সন চালুর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে আরো অধিক সংখ্যক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

শ্রম সচিব আরো বলেন টোল-ফ্রি নম্বর ১৬৩৫৭ সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে। এ সেবার মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন/মজুরি সংক্রান্ত, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, অন্যায়ভাবে বরখাস্ত, কর্মসংক্রান্ত সুবিধা কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, কর্মঘণ্টা ও ছুটির বিষয়, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, শ্রম সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহ

আজহার মাহমুদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কবি আছে যিনি একদিকে প্রেম ও সংগীতের কবি, আবার অন্যদিকে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অগ্নিকণ্ঠস্বর। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই বিরল কবিদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন শান্তির স্রষ্টা, তেমনি নজরুল ছিলেন বিদ্রোহের রাজা। তাঁর সাহিত্যকীর্তির সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতাসমূহ, যেখানে তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি তোলেননি, বরং মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মুক্তির জন্য এক অনন্য ঘোষণা দিয়েছেন। নজরুল নিজেই বলেছেন, আমি বিদ্রোহী ...। এই উচ্চারণ কেবল একটি কবিতার বাক্য নয়, বরং নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

নজরুলের কবিতার বিদ্রোহী সত্তাকে বুঝতে হলে প্রথমে তাঁর জীবনের প্রেক্ষাপট জানা জরুরি। তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্র মুসলিম পরিবারে, কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্র পরিবেশে। বাল্যকালে লেটো দলে গান গাওয়া, মক্তবে পড়াশোনা, আবার পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া— এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। সৈনিক হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কাছ থেকে দেখেছিলেন, যা তাঁকে মানুষের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্য সমালোচক ড. আনিসুজ্জামান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নজরুলের কাব্যচেতনাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, ফলে তাঁর কবিতায় দেখা গেল নিপীড়নের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ উচ্চারণ।' (*বাংলা সাহিত্য ইতিহাস*, ১৯৮৩)

১৯২২ সালে প্রকাশিত বিদ্রোহী কবিতাকে কেন্দ্র করে নজরুল প্রথমবারের মতো বাংলা কাব্যধারায় বজ্রাঘাত করলেন। কবিতাটির প্রকাশের পরেই সাহিত্য অঙ্গনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এখানে কবি নিজেকে একাধারে শিব, কালী, বজ্র, ঝড়, অগ্নি, অসুর, দেবতা, যিশু ও মুহাম্মদের সৈনিক হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি যেন সমস্ত মহাজাগতিক শক্তিকে নিজের ভেতরে ধারণ করেছেন। কবি নিজেকে বলেছেন, 'আমি চিরবিদ্রোহী বীর, বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।' এই কবিতা যে শুধু সাহিত্যিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আলোড়ন তুলেছিল। সে সময় ব্রিটিশ সরকার নজরুলের কবিতা ও সামগ্রিক সাহিত্যকর্মকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। তাঁর ধূমকেতু পত্রিকা বার বার বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁকে কারাগারেও পাঠানো হয়। এভাবে তাঁর কবিতা নিছক সাহিত্যচর্চার বাইরে গিয়ে এক প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

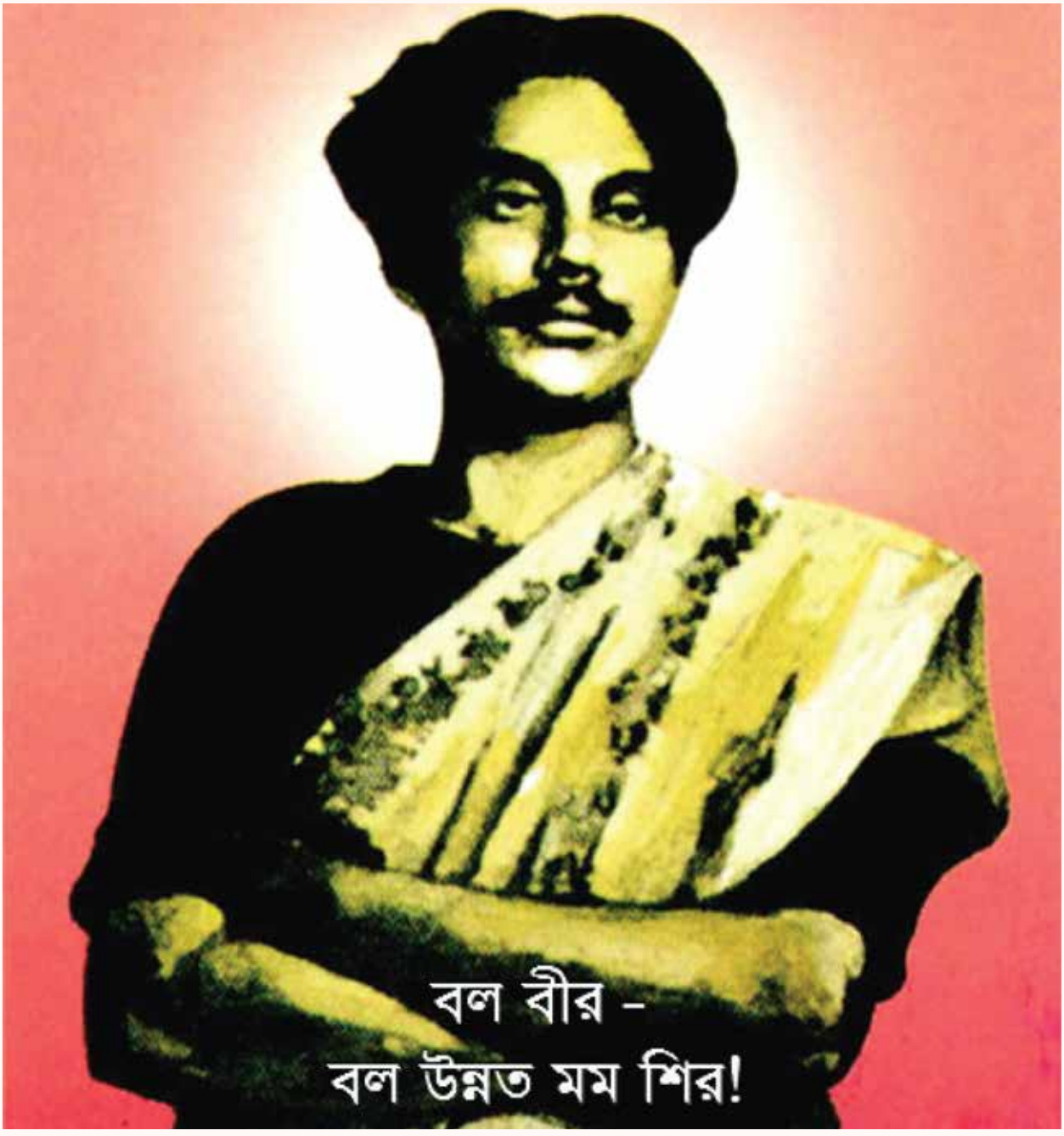

নজরুলের বিদ্রোহী কাব্যের বৈশিষ্ট্য মূলত দ্বিমুখী। একদিকে ধ্বংস, অন্যদিকে সৃষ্টি। তিনি পুরাতনকে ভেঙে নতুনকে গড়তে চেয়েছেন। সমালোচক সেলিম আল দীন তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নজরুলের বিদ্রোহ ধ্বংসের ভেতর দিয়েই সৃষ্টির জন্ম দেয়, তাঁর ঝড়ো চেতনার ভেতর লুকিয়ে আছে এক নির্মল শান্তির আকাঙ্ক্ষা।' (*নজরুলের কাব্যভাষা*, ১৯৯১) এজন্যই নজরুলের কবিতায় বজ্র ও ফুল, ঝড় ও সংগীত, আগুন ও আলো একসাথে উপস্থিত থাকে। তাঁর কবিতার এই দ্বৈততা বিদ্রোহকে একান্ত মানবিক রূপ দিয়েছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বার বার বজ্র, আগুন, ঝড়, শিব, কালী ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করে বিদ্রোহের শক্তিকে প্রকাশ করেছেন। আবার যিশু, মুহাম্মদ, বুদ্ধ, কৃষ্ণের মতো ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় চরিত্রও তাঁর কবিতায় প্রতীক হয়ে আসে। এর ফলে তাঁর কবিতা এক ধর্ম বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সার্বজনীন হয়ে ওঠে। ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল যে পরিমাণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপমা ব্যবহার করেছেন, তা কেবল কাব্যের সৌন্দর্য বাড়ায়নি, বরং বিদ্রোহী চেতনার

সার্বজনীনতা প্রকাশ করেছে।' (*কাজী নজরুল ইসলাম: সাহিত্য ও সমাজচেতনা*, ২০০৩)

নারীর অবস্থান নিয়েও নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী। তাঁর 'নারী' কবিতায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন যে, নারী কেবল করুণা বা দয়ার পাত্র নন, বরং তিনি পুরুষের সমান অংশীদার। সমাজে প্রচলিত নারী-অবমূল্যায়ন, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি কবিতার ভাষায় বিদ্রোহ করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নজরুল নারীর মুক্তিকে বিদ্রোহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন। তাই তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় নারীমুক্তির সুর অনিবার্যভাবে ধ্বনিত হয়েছে।' (*বিচিত্রা*, ১৯৪০) এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্যে নারী-অধিকার ও মুক্তির এক অগ্রদূত।

'বিদ্রোহী' কবিতায় আরেকটি বড়ো দিক হলো– সাম্যবাদী চেতনা। নজরুলের সাম্যবাদী কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন, 'গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।' এখানে কবি ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলিম সব ভেদাভেদ অস্বীকার করেছেন। তিনি এক এমন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে কোনো শ্রেণি, কোনো জাতি, কোনো ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন থাকবে না। সমালোচক

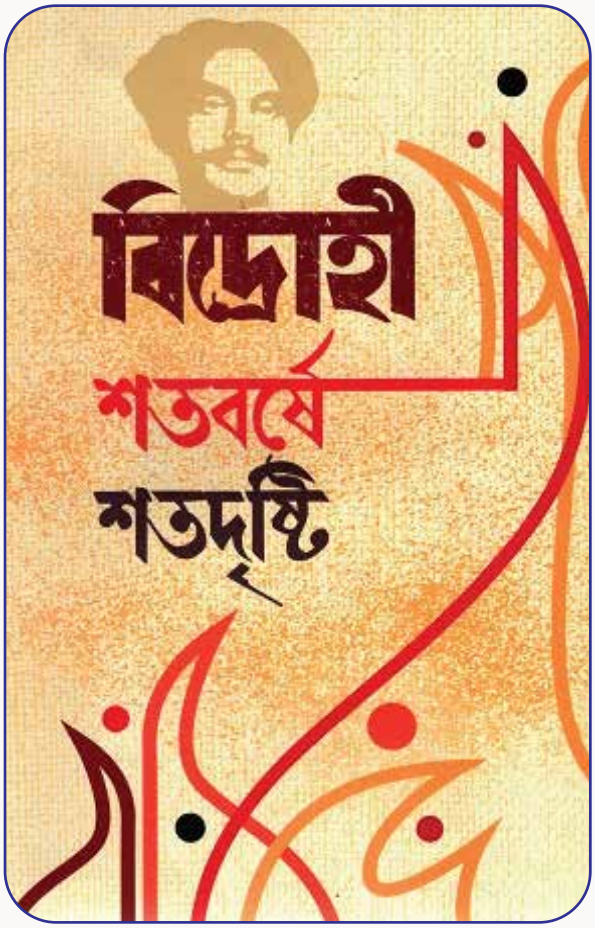

মোফাখ্খার হোসেন মন্তব্য করেছেন, 'নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা ছিল ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির এক সাহসী ঘোষণা, যা পরবর্তী প্রজন্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।' (*বাংলাদেশে নজরুলচর্চা*, ১৯৮৭)

জাতীয়তাবোধও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা এক রণধ্বনি হয়ে উঠেছিল। তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। 'চল্ চল্ চল্' কবিতায় তিনি যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন– 'দুর্দম, দুর্বার, দুর্বিনীত/চল্ চল্ চল্।' এই কবিতা ছিল এক ধরনের সংগীত, যা তরুণসমাজের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসবিদ সুশীলকুমার দে বলেন, 'নজরুলের কবিতা ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদকে এক নতুন গতি দিয়েছিল। তাঁর কবিতার শক্তিশালী ধ্বনি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে এক বিশাল প্রেরণাশক্তি।' (*Indian Literature under Colonial Rule*, ১৯৫২)

তবে নজরুলের বিদ্রোহ কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর বিদ্রোহ ছিল মানবতার। তিনি ইসলামের নবী মুহাম্মদ, খ্রিষ্টান ধর্মের যিশু, হিন্দু ধর্মের কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে সমানভাবে কবিতায় এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃত বিদ্রোহ কোনো ধর্ম বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ড. রফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় যে মানবতাবাদী চেতনা প্রবাহিত হয়েছে, তা তাঁকে শুধু বাঙালির কবি নয়, বরং বিশ্বমানবতার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।' (*নজরুল: জীবন ও সাহিত্য*, ১৯৭২)

সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা এক নতুন ধারা তৈরি করেছে। তিনি বাংলা কাব্যে নতুন ছন্দ এনেছেন। অনুপ্রাস, স্বরসংগতি, ধ্বনিগত গতি এবং পৌরাণিক-ঐতিহাসিক চিত্রকল্প তাঁর কবিতায় এক শক্তিশালী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাসমূহ কেবল সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদর্শন নয়, বরং ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও মানবতার এক সমন্বিত দলিল। তাঁর কবিতা মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তির প্রেরণা দেয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। আজও যখন পৃথিবীর কোনো প্রান্তে দমন-শোষণ চলছে, তখন নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিদ্রোহ মানে ধ্বংস নয়, বরং নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান। তাই কাজী নজরুল ইসলাম আজও বাঙালির চেতনার বিদ্রোহী কবি, মানবতার মুক্তিসংগীতের অমর গায়ক।

আজহার মাহমুদ: লেখক ও সাংবাদিক,
azharmahmud705@gmail.com

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ১লা আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় বিজয় সরণী মেট্রোরেল স্টেশন প্রাঙ্গণে জুলাই আর্টওয়ার্ক -এর উদ্বোধন করেন। এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ উপস্থিত ছিলেন— পিআইডি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্লোগানগুলো

মুহাম্মদ ইসমাঈল

স্লোগান যে-কোনো আন্দোলনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও শ্রুতিগ্রাহ্য প্রকাশভঙ্গি। এটি শুধু একটি বাক্য নয়; বরং এটি একসঙ্গে ভাষা, আবেগ, চেতনা ও প্রতিরোধের একটি সংগীত। সমাজে যখন অনিয়ম, নিপীড়ন বা শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নামে, তখন তারা প্রথমে যা খোঁজে তা হলো– একটি ভাষা, যার মাধ্যমে তারা প্রতিবাদ জানাতে পারে। এ ভাষাই স্লোগান। শেখ হাসিনা সরকারের নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের সর্বব্যাপী বিস্ফোরণ ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। শ্রমজীবী, কৃষক, পোশাকশ্রমিক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং তাদের আবেগ, বেদনা ও প্রতিরোধের মনোভাব প্রতিফলিত হয় স্লোগানগুলো।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি কোটা সংস্কার আন্দোলনের সূত্র ধরে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। ২০২৪ সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে শুরু হয় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। অবশেষে মাত্র ৩৬ দিনে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। অভূতপূর্ব এই গণ-আন্দোলনকে চাঙা রেখেছিল বিভিন্ন স্লোগান, যা উত্তাল সময়ে রাজপথে মানুষকে সাহস ও প্রেরণা দিয়েছিল। এরমধ্যে অনেক স্লোগান ছাত্র-জনতার রক্তে বারুদের মতো বিস্ফোরিত হয়েছিল। ভাইরাল এসব স্লোগান স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এর সঙ্গে ছিল দেয়ালজুড়ে আঁকা গ্রাফিতি। গণ-আন্দোলনে নানান ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসে স্লোগানেও। আন্দোলনকারীদের মধ্যে এসব স্লোগান বারুদের মতো কাজ করে, জোগায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেরণা।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন স্লোগান। বদলেছে দাবির ভাষাও। জুলাইয়ের মাঝামাঝি যখন আন্দোলনে ছাত্রলীগ হামলা চালায় এবং রাজাকার কটূক্তির পর 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার, কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার', 'চাইলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার', 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' এবং 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ' ইত্যাদি স্লোগান শোনা যায়।

১৬ই জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ। এর পর থেকে 'আমার খায়, আমার পরে, আমার বুকেই গুলি করে', 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাইরে ফিরায়া দে', 'বন্দুকের নলের সাথে ঝাঁজালো বুকের সংলাপ হয় না' এবং 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে'– এসব স্লোগান তীব্র হয়ে ওঠে।

আবু সাঈদের মৃত্যুর মাত্র দুদিন পর মুগ্ধর নির্মম পরিণতি মেনে নেয়নি ছাত্র-জনতা। পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে গেলে সরকার সংলাপে বসতে চেয়েছিল। তবে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ১৮ই জুলাই রাতে লেখেন, 'রক্ত মাড়িয়ে সংলাপ নয়'।

শেখ হাসিনার বিকল্প বাংলাদেশে নেই, গত ১৬ বছরে অসংখ্যবার এই কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সত্যিকার অর্থে বিকল্প নিয়ে ভাবনার উত্তর তৈরি হয়। কে ধরবেন দেশের হাল, এমন প্রশ্নে তখন ছাত্র-জনতার স্লোগান ছিল– 'বিকল্প কে? আমি, তুমি, আমরা'।

পরিস্থিতি যত বদলেছে, তত যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন স্লোগান। ২রা আগস্ট রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিয়েছিলেন, 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার', 'যে হাত গুলি করে, সে হাত ভেঙে দাও' এবং 'অ্যাকশন-অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। ৩রা আগস্ট ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ থেকে শোনা যায়, 'আমার ভাই কবরে, খুনিরা কেন বাইরে', 'আমার ভাই জেলে কেন' এবং 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না' এসব স্লোগান।

সায়েন্স ল্যাব মোড়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে শোনা যায়, 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো' এবং 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত'–এর মতো স্লোগানগুলো।

৩রা আগস্ট দুপুরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারসহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না'; 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়', 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার' এবং 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না' ইত্যাদি স্লোগান দিয়েছিলেন।

তবে পুরো আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি যেসব স্লোগান সাড়া ফেলেছিল সেটা হলো– 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর', 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে', 'আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাইরে ফিরায়া দে', 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে', 'কলম ছেড়ে লাঠি ধর, স্বৈরাচার বিদায় কর', 'শেখ হাসিনার গদিতে, আগুন জ্বালাও একসাথে', 'শেখ হাসিনার সরকার আর নাই দরকার', 'এক দফা এক দাবি, শেখ হাসিনা কবে যাবি', 'দফা এক দাবি এক, খুনি হাসিনার পদত্যাগ', 'এক, দুই, তিন, চার, শেখ হাসিনা গদি ছাড়', 'ছিঃ ছিঃ হাসিনা, লজ্জায় বাঁচি না' ইত্যাদি।

বহুল উচ্চারিত স্লোগানগুলোর একটি তালিকা করা যেতে পারে। স্লোগানগুলো হলো:

- লেগেছে রে লেগেছে– রক্তে আগুন লেগেছে।
- কোটা না মেধা– মেধা মেধা।
- জেগেছে রে জেগেছে– ছাত্র সমাজ জেগেছে।
- সারা বাংলায় খবর দে– কোটা প্রথা কবর দে।
- দফা এক দাবি এক– কোটা নট কাম বেক।
- তোর কোটা তুই নে– আমার ভাইরে ফিরায়া দে।
- দালালি না রাজপথ– রাজপথ রাজপথ।
- ঝড় বৃষ্টি আঁধার রাতে– আমরা আছি রাজপথে।
- দিয়েছি তো রক্ত– আরো দেবো রক্ত।
- রক্তের বন্যায়– ভেসে যাবে অন্যায়।
- ঢাবির অ্যাকশন– ডাইরেক্ট অ্যাকশন।
- ছাত্র সমাজের অ্যাকশন– ডাইরেক্ট অ্যাকশন।
- মেধাবীদের অ্যাকশন– ডাইরেক্ট অ্যাকশন।
- বায়ান্নোর হাতিয়ার– গর্জে উঠুক আরেক বার।
- বায়ান্নোর বাংলায়– বৈষম্যের ঠাঁই নাই।

- একাত্তরের বাংলায়– বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
- আপোশ না সংগ্রাম– সংগ্রাম সংগ্রাম।
- আর করিস না শেখ শেখ– দেশের দিকে চাইয়া দেখ।
- গোপালগঞ্জের গোলাপী– আর কত কাল জ্বালাবি।
- চশমা ওয়ালা বুবুজান– নৌকা লইয়া ভারত যান।
- ছিঃ ছিঃ হাসিনা– লজ্জায় বাঁচি না।
- দিল্লি না ঢাকা– ঢাকা ঢাকা।
- আওয়ামী লীগের দালালেরা– হুশিয়ার সাবধান।
- গুলি করে আন্দোলন– বন্ধ করা যাবে না।
- আর নয় প্রতিরোধ– এখন থেকে প্রতিশোধ।
- তুমি কে আমি কে– রাজাকার রাজাকার।
- কে বলেছে কে বলেছে– স্বৈরাচার স্বৈরাচার।
- একটা একটা লীগ ধর– ধইরা ধইরা জবাই কর।
- হাসিনার গদিতে – আগুন জ্বালাও একসাথে।
- লাশের ভেতর জীবন দে– নইলে গদি ছাইড়া দে।
- যে হাত গুলি করে– সে হাত ভেঙে দাও।
- আমার সোনার বাংলায়– বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
- চেয়েছিলাম অধিকার– হয়ে গেলাম রাজাকার।
- ক্ষমতা না জনতা– জনতা জনতা।
- বুকের ভেতর অনেক ঝড়– বুক পেতেছি গুলি কর।
- কে এসেছে কে এসেছে– পুলিশ এসেছে পুলিশ এসেছে।
- কি করছে কি করছে– স্বৈরাচারের পা চাটছে।
- We want justice–We want justice.
- বৌত দিন হাঁইয়্যে– আর ন হাঁইয়্যে।
- আমার ভাই কবরে– খুনি কেন বাহিরে?
- সীমান্তে মানুষ মারে– বিজিবি কি করে?
- সীমান্তের বিড়ালেরা– সীমান্তে ফিরে যা।
- আমার ভাইয়ের রক্ত– বৃথা যেতে দেবো না।
- জ্বালোরে জ্বালো– আগুন জ্বালো।
- ছাত্রলীগের দালালেরা– হুঁশিয়ার সাবধান।
- তেলের দাম কমাই দে– নইলে গদি ছাইড়া দে।
- পালাইছে রে পালাইছে– শেখ হাসিনা পালাইছে।
- আমার সোনার বাংলায়– বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
- কোটা একটা ভিক্ষা–মুক্তি পাক শিক্ষা।
- ধর্ম যার যার– দেশ সবার।
- দুর্নীতি করব শেষ– সবাই মিলে গড়ব দেশ।
- আবু সাঈদের রক্ত– বৃথা যেতে পারে না।
- দফা এক দাবি এক– খুনি হাসিনার পদত্যাগ।
- ১, ২, ৩, ৪– শেখ হাসিনার গদি ছাড়।
- আবু সাইদ মুগ্ধ– শেষ হয়নি যুদ্ধ।
- হামার বেটাকে মারলু ক্যান।
- পেছনে পুলিশ সামনে স্বাধীনতা।
- মরতে যখন এসেছি আমরা মরেই ঘরে ফিরবো।
- অনাস্থা অনাস্থা স্বৈরতন্ত্রে অনাস্থা।
- ভুয়া, ভুয়া (পুলিশের উদ্দেশ্যে)
- আসমান কাঁপে– আপনার মন কাঁপে না?
- গোলামী না ইনকিলাব– ইনকিলাব, ইনকিলাব।
- পা চাটলে সঙ্গী– না চাটলে জঙ্গি।
- হাল ছেড়ো না বন্ধু– কণ্ঠ ছাড়ো জোরে।
- ফাইট ফর ইউর রাইটস।
- আমার খায় আমার পরে– আমার বুকেই গুলি করে।
- পুলিশ ছাড়া মাঠে নাম– ভুলিয়ে দিব তোর বাপের নাম।
- একে তো কোটার বাঁশ– তার উপর প্রশ্ন ফাঁস।
- তুমি কে? আমি কে? বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।
- আর ন হাঁইয়্যে– বোত দিন হাঁইয়্যে।
  (আর খেয়ো না, অনেক দিন খেয়েছো)
- আইয়ুব থেকে হাসিনা– স্বৈরাচার মানি না।
- সেইম সেইম– ডিক্টেটর।
- 1, 2, 3, 4– Sheikh Hasina No More.
- এক দফা এক দাবি– শেখ হাসিনা কবে যাবি?

ইত্যাদি স্লোগান এই ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে আরও সজীব ও সুদৃঢ় করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এমন অসংখ্য স্লোগান ছিল, আবার যার কোনোটি ছিল আগুনে ঘি। কোনোটি আন্দোলনের শক্তি। এই স্লোগানগুলো শুধু সময়ের দলিল নয়, বরং তারা ইতিহাসের ভাষা রচনা করে। এগুলো ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি ভেঙে দিয়ে নতুন বিকল্পের সম্ভাবনা তোলে। জুলাই বিপ্লবের স্লোগানগুলো তাই শুধু বিক্ষোভের নয়, বরং ভাষার, চেতনার এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশের জন্য সংগ্রামের সজীব রূপরেখা।

জুলাই বিপ্লবের স্লোগানগুলো দেখায়, কীভাবে একটি আন্দোলন তার ভাষা নিজেই নির্মাণ করে নেয়, কীভাবে মানুষ রাষ্ট্রীয় বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করে। কখনো তারা ধর্মীয় চেতনার আশ্রয় নেয়, কখনো জাতীয়তাবাদের ভাষায় কথা বলে, কখনো বা সরাসরি শাসক ও শত্রুকে আঘাত করে। জুলাই আন্দোলনের স্লোগানগুলো শুধু ক্ষোভ নয়– এগুলো ছিল রাজনৈতিক চেতনা, আত্মপরিচয়, জাতির ভবিষ্যৎ ও নৈতিক অবস্থানের বহুমাত্রিক ভাষ্য। স্লোগান ছিল এ আন্দোলনের দার্শনিক ও সাংগঠনিক মেরুদণ্ড। একটি স্লোগান শুধু রাজনৈতিক অভিব্যক্তি নয়, বরং সমাজের অন্তর্লীন চেতনা ও সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। আজকের বাংলাদেশে স্লোগান তাই শুধু বিদ্রোহ নয়– ভবিষ্যতের ভাষাও।

মুহাম্মদ ইসমাঈল: কবি, প্রাবন্ধিক, সাবেক শিক্ষক, জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি ও জীবন সদস্য, ইতিহাস পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৩রা আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় নৌবাহিনী সদরদপ্তর প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন— পিআইডি

আসুন বৃক্ষরোপণ করি

মোহাম্মদ আলী সরকার

গ্রীষ্মে চরম দাবদাহের কথা নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাইনি। দেশব্যাপী দাবদাহের যে তীব্রতা দেখা গেছে তা অতীতের অনেক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরে ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন স্টেশনের উপাত্ত সংরক্ষিত থাকলেও সব স্টেশনের সকল তথ্য নেই। সব স্টেশনের সুনির্দিষ্ট সব তথ্য সংরক্ষিত আছে ১৯৮১ সাল থেকে। সকল উপাত্ত বিশ্লেষণের পর জানা যায় যে, ১৯৪৮ সালের পর বর্তমান পর্যন্ত ২০২৪ সালের এপ্রিলে এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি তাপপ্রবাহ হয়েছে, তাও আবার সকল রেকর্ড ভেঙে টানা সর্বোচ্চ ২৭ দিন।

এই অস্বাভাবিক দাবদাহের অন্যতম কারণ দেশে গাছের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে কমে যাওয়া। কিন্তু পরিতাপের বিষয় শুধু গ্রীষ্মের তাপদাহের সময়ই আমরা বৃক্ষনিধনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠি, বৃক্ষরোপণের পক্ষে সরব হয়ে উঠি। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হই না। ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য যে-কোনো দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু জাতীয় সংসদের এক প্রশ্নোত্তরপর্ব থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যে পরিমাণ বনভূমি অবশিষ্ট আছে তাও বননিধনের ধকলে বিপর্যস্ত। তাই তাপদাহ সহনীয় করতে বর্তমানে যে বনভূমি রয়েছে তা সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং বৃদ্ধির দিকে জোর দিতে হবে। সূর্যের প্রখর রোদ আর শুষ্ক গরম বাতাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বৃক্ষরোপণ।

'গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান'– বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত স্লোগানগুলোর মধ্যে একটি। তীব্র তাপপ্রবাহের পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে উপলব্ধি হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলাদেশে বৃক্ষরোপণের পক্ষে সরব প্রচারণা চালানো হয়েছে। তবে বৃক্ষরোপণের সময় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত– উপযুক্ত সময়, স্থান ও ধরন বুঝে গাছ লাগানো প্রয়োজন। নতুবা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ১২ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বরে 'Better Dhaka District Initiatives' কর্মসূচির আওতায় এক দিনে এক লাখ চারা গাছ রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন— পিআইডি

উপকারের বদলে ক্ষতি বেশি হতে পারে। তাই সবচেয়ে ভালো ফল লাভের জন্য আমাদের জানতে হবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়

অন্যান্য প্রাণিকুলের মতো গাছেরও জীবনচক্র আছে। গাছ থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম প্রস্বেদন। গ্রীষ্মকালে প্রস্বেদনের মাত্রা বেশি হয় বলে অধিক পরিমাণে পানি বেরিয়ে যায়। গাছ মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে পানি টেনে সেই ঘাটতি পূরণ করে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে মাটির পানি শুকিয়ে যায় বলে সে সময় প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। ফলে বৈজ্ঞানিক কারণেই গাছ লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল।

কৃষি তথ্য সার্ভিস বর্ষায় গাছ লাগানোর জন্য আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। তাদের মতে, প্রথম বৃষ্টির পরপরই চারা লাগানো উচিত হবে না। কারণ প্রথম কয়েকদিন বৃষ্টির পর মাটি থেকে গরম গ্যাসীয় পদার্থ বের হয় যা চারাগাছের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চারা মারাও যেতে পারে।

যে-কোনো চারারোপণের সর্বোত্তম সময় দিনের শেষভাগে, বিকেলের সময়। অন্যদিকে বর্ষার শুরু অথবা শেষের দিকে

চারাগাছ লাগানো ভালো। কারণ বর্ষায় সম্ভাব্য বন্যার আগেই যেন চারাগাছ কিছুটা বড়ো হওয়ার সুযোগ পায় অথবা বন্যার ক্ষতি থেকে গাছকে রক্ষা করা যায়।

কী ধরনের গাছ লাগানো প্রয়োজন

স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গাছের ধরন নিয়েও ভাবার অবকাশ রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফুল গাছ থেকে শুরু করে ফলদ, ঔষধিসহ বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। ফুল যেহেতু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সেহেতু সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ফুলগাছ লাগানো যেতে পারে। তবে ঋতুভেদে ফুলের ভিন্নতার কারণে কোনো কোনো সময় ফুলের গাছ নাও বেঁচে থাকতে পারে। সেজন্য ছোটো আকারের ফুল গাছের সাথে বকুল, শিউলি, শেফালি বা কাঠগোলাপের মতো বড়ো আকারের ফুল গাছ লাগানো যেতে পারে।

ফুল গাছের পাশাপাশি ফলদ বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। ফলদ গাছ ছায়া সুশীতল পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পাখিসহ অন্যান্য প্রাণিকুলের আশ্রয় ও খাবারের উৎস হয়ে উঠবে। আম-কাঁঠালের পাশাপাশি কড়ই বা শাল গাছও ছায়া দিতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, যানবাহন চলাচলের পথে এসব গাছ লাগালে তা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

গাছ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা

সব জায়গার মাটি সব গাছের জন্য উপকারী নয়। সেজন্য মাটির ধরন বুঝে গাছ লাগানো প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষে যেহেতু মাটির ধরন বোঝা সম্ভব নয়, সেজন্য সহজ উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে ধরনের গাছ সহজে বিকশিত হতে পারবে সেখানে সে ধরনের গাছই লাগানো।

দেশি প্রজাতির যেসব গাছ আছে সেগুলো আমাদের প্রকৃতির সাথে সহজে অভিযোজন করতে পারে। এতে পরিবেশের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে বেশ কিছু বিদেশি প্রজাতির গাছ আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত। অনেকে না জেনে বা চারার দাম তুলনামূলক কম দেখে এসব গাছ লাগিয়ে থাকেন যা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উত্তরবঙ্গে একসময় ধান গাছের পাশে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হতো। কয়েক বছর পর দেখা যায় এর ফলে আশপাশের মাটিতে দূর্বা ঘাসও জন্মাচ্ছে না, ধান উৎপাদনও আশানুরূপ নয়। কারণ এ প্রজাতির গাছ মাটি থেকে অধিক পরিমাণে পানি শুষে নিয়ে আশপাশের গাছের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এজন্য বিশেষজ্ঞরা বিদেশি প্রজাতি যেমন– ইউক্যালিপটাস, সেগুন, রেইনট্রি, আকাশমনি, বাবলা বা বাওবাবের মতো বিদেশি প্রজাতির গাছ না লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এসব গাছের জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হয়, আবার দেশি গাছের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে মাটি থেকে পুষ্টি শুষে নেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা এখন উন্নত, উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত– সব দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এরই অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সকল দেশেই একটি প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি। ২০১৯ সালে ইথিওপিয়ার নোবেল বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ তার দেশে তিন মাসের মধ্যে চারশো কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। 'গ্রিন লিগ্যাসি ইনিশিয়েটিভ' নামে তার এ প্রচারণা দেশের মারাত্মক বন উজাড়ের প্রবণতা থেকে রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

ইথিওপিয়ার এ প্রচারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেসময় কিছু পশ্চিমা দেশও তাদের কর্মসূচিতে বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। যুক্তরাজ্যের নির্বাচনি প্রচারণাকালে কনজারভেটিভ পার্টি প্রতিবছর ৩ কোটি, লেবার পার্টি ২০৪০ সালের মধ্যে ২০০ কোটি এবং গ্রিন পার্টি ২০৩০ সালের মধ্যে ৭০ কোটি বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে।

পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিবেশ মেলা, বৃক্ষ মেলা, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে আমাদের সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। যার যেখানে সুযোগ আছে সেখানে যদি আমরা গাছ লাগানোর চেষ্টা করি, আলাদা জায়গা না পেলে অন্তত ছাদ বাগান করি, নিয়মিত পরিচর্যা করে সেগুলো বেড়ে উঠতে সাহায্য করি– তাহলে এ দেশ আবারও সবুজ শ্যামলীমায় ভরে উঠবে। আর সে সময়টা এখনই। বেশি করে গাছ লাগিয়ে আমরা গ্রীষ্মের দাবদাহ, প্রকৃতির রুদ্র আচরণকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হই– আসুন বৃক্ষরোপণ করি।

মোহাম্মদ আলী সরকার: প্রকল্প পরিচালক, 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস, ঢাকা

জুলাই আন্দোলনের বীরঃ শহিদ সাজ্জাদ হোসেন

মিয়াজান কবীর

পথে-প্রান্তরে ভাসে সুর
ভাওয়াইয়া গানের রংপুর।

ধরলা-তিস্তা আর ঘাঘট নদী বয়ে চলেছে রংপুরের বুক চিড়ে। নদীর কূল ঘেঁষে ফসলের বিস্তৃত মাঠ, ধু-ধু প্রান্তর। গাঁয়ের আঁকাবাঁকা পথ মিশেছে নদীর কূল ঘেঁষে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলে গরুর গাড়ি চিলমারি বন্দর।

এই রূপময় রংপুরের কামালকাছনা এলাকায় ১৯৯৫ সালের ১০ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন মো. সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদ হোসেনের বাবার নাম মো. ইউসুফ আলী ওরফে বাবু মিয়া। মায়ের নাম মোসাম্মৎ ময়না বেগম। বাবা-মায়ের তিন মেয়ে দুই ছেলের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

বাবা ইউসুফ আলী বাবু মিয়া ছিলেন একজন ফল বিক্রেতা। আর মা একজন গৃহিণী। বাবার ইচ্ছে ছিল সাজ্জাদকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! বাবা অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান পরপারে। শৈশবে বটবৃক্ষের মতো বাবাকে হারানোর বেদনা নিয়ে বেড়ে ওঠেন সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদের ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্য ছিলেন আটজন। সম্পত্তি বলতে কেবল বাবার রেখে যাওয়া দুই শতক বাড়ির জায়গা শুধু রয়েছে। তাই আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন পঞ্চম শ্রেণির বেশি পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি সাজ্জাদ হোসেনের।

নিদারুণ অর্থকষ্টে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে জীবন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনি। পুরো পরিবারের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন কিশোর সাজ্জাদ হোসেন। বাবার ফল বিক্রির ব্যবসায় নিয়োজিত হন সাজ্জাদ। সাজ্জাদের সামান্য আয় দিয়ে আট সদস্যের পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে ছোটো ভাইটিও পড়ালেখা ছেড়ে ফলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হন। দুই ভাইয়ের সামান্য আয়ের টাকা দিয়ে কোনোরকম সংসার চলতে থাকে। অভাব-অনটন আর দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে সাজ্জাদ হোসেন বসবাস করতেন রংপুর সিটি করপোরেশনের শিক্ষাঙ্গন রোডে।

কালের পরিক্রমায় সাজ্জাদ হোসেন যৌবনদীপ্ত হয়ে ওঠেন। ২০১৭ সালে বিয়ে করেন রংপুরের তাজহাট এলাকায় জাহাঙ্গীর আলম জালালের বড়ো মেয়ে জিতু বেগমকে। বিয়ের দু'বছর পর ২০১৯ সালে এক মেয়ের বাবা হন। মেয়ের নাম রাখা হয় সিনহা। সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যেও পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখশান্তিতে বসবাস করতে থাকেন সাজ্জাদ হোসেন।

সাজ্জাদ হোসেন ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবিক। মানুষের সুখে তিনি সুখী হতেন। আবার মানুষের দুঃখে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়তেন। মানুষের আপদ-বিপদে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন।

২০২৪ সালে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ-ছাত্রলীগ নির্মমভাবে শুরু করে অত্যাচার। ১৬ই জুলাই রংপুরে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। আবু সাঈদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। রংপুরেও সংগ্রামী ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। এই বীর সংগ্রামী সাজ্জাদ হোসেন ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিছিলে একাকার হয়ে যান। মায়ের নিষেধ, স্ত্রীর বারণ, আত্মীয়স্বজনের বাধা উপেক্ষা করে মিছিলে-মিছিলে পথ চলতে থাকেন। কাঁপিয়ে তোলেন রংপুরের রাজপথ।

১৯শে জুলাই শুক্রবার। জুম্মার নামাজের পর পৌর এলাকায় প্রচণ্ড আন্দোলনে রংপুরের জনপদ কেঁপে ওঠে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। সাজ্জাদ হোসেন তেজোদীপ্তভাবে ছুটে যান মিছিলে। তিনি ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত সংগ্রামী ছাত্র-জনতাকে খাওয়াতে রুটি আর পানি নিয়ে এগিয়ে যান। রুটি আর পানি হাতে ছুটে চলেন মিছিলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এমন সময় সাজ্জাদ হোসেনকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। পুলিশের ছোঁড়া একটি গুলি এসে সাজ্জাদের বাম পাঁজর দিয়ে ঢুকে ডান পাঁজর দিয়ে বের হয়ে যায়। পুলিশের নির্মম গুলিতে সাজ্জাদ রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েন রংপুর সিটি বাজারের সামনে। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা সাজ্জাদকে রক্তাক্ত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাজ্জাদ হোসেনের মৃত্যুতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তারপর পুলিশ আর ছাত্রলীগের বাধা অতিক্রম করে সাজ্জাদের মরদেহ নিয়ে আসা হয় তার নিজ বাড়িতে। সাজ্জাদের মরদেহ ঘিরে পরিবার-পরিজনের কান্নায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরের দিন রংপুরে মিস্ত্রিপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয় সাজ্জাদের মরদেহ। এখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

শহিদ মো. সাজ্জাদ হোসেন ছোটোবেলায় বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে পেয়েছিলেন আশ্রয়। সেই মাকে রেখে চিরবিদায় নিলেন সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদ হোসেনের স্ত্রী জিতু বেগম, ফুলের মতো নিষ্পাপ এক কন্যাসন্তান, ভাইবোন আর আত্মীয়স্বজনকে রেখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উৎসর্গ করে গেলেন নিজের অমূল্য জীবন। শহিদ সাজ্জাদ হোসেন স্বৈরাচার মুক্ত করতে ঢেলে দিলেন বুকের তাজা রক্ত।

শহিদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। যে পুলিশের নির্মম গুলিতে সাজ্জাদ হোসেনের জীবনাবসান হয়েছে সেই ঘাতক পুলিশের বিচারের দাবি জানাচ্ছে তার পরিবার-পরিজনসহ সমগ্র দেশবাসী।

মমতাময়ী মা হারালেন নাড়িছেঁড়া ধন। বোন হারালেন ভাই। ভাই হারালেন জীবন চলার পথের সাথি। জায়া হারালেন প্রাণ প্রিয়তম স্বামী। ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু সন্তান হারালো তার বাবাকে। অবুঝ শিশুকন্যা বুঝে না তার বাবার মৃত্যুর মর্মবেদনা। বাবার ছবি দেখে শুধু পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অকালে বিধবা হওয়া জিতু বেগম শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে ভাবেন অনাগত ভবিষ্যতের কথা।

শহিদ মো. সাজ্জাদ হোসেন জুলাই আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক। তার বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকবে শহিদ সাজ্জাদ হোসেনের ছবির প্রতিচ্ছবি।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক

নকশি পাখা: বাংলাদেশের লোকজ শিল্প

জায়েদুল আলম

মনে পড়ে খুব ছোটোবেলায় যখন সন্ধ্যার সময় পড়াশোনা করে উঠতাম তখন প্রায়ই বাড়িতে লোডশেডিং হয়ে যেত। তাই সেই সময় আমার দাদু আমাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন। বৈদ্যুতিক চালিত পাখার থেকে হাতপাখার হাওয়া কিন্তু খুব মিষ্টি। তাই জীবনে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আসার পরেও যখন কোনো মেলায় যেতাম, তখন সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের হাতপাখা কিনে আনতাম। কখনও সেগুলো কাজে লাগত, আবার কখনও ঘরের কোণে পড়ে থাকত। তবু সেগুলো দেখলে ছোটোবেলার স্মৃতিটা কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠত।

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে গ্রিক-রোমানদের যুগে হাতপাখার প্রথম প্রচলন হয়। চীন ও জাপান থেকে ইউরোপীয় বণিকরা প্রথম হাতপাখা নিয়ে আসেন। সেই হাতপাখাগুলোতে মনিমুক্তো, সোনারুপো, হাতির দাঁত, বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ঘটনা, ধর্মীয় কাহিনি, ফুল, ফল, পাখি, নানা নিয়মাবলি আঁকা থাকত। কারণ এইসব চিত্র দেখেই সাধারণ মানুষ বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পেতেন। প্রথমদিকে পাখাগুলো একটি ভাঁজের হলেও পরবর্তীতে পাখা ভাঁজে ভাঁজে তৈরি হতে শুরু হয়। আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইউরোপের হাত ধরে হাতপাখা তৈরির শুভসূচনা হলেও, চীনের পাখার বাজার কিন্তু রমরমিয়ে চলতে শুরু করে। পুরানো দিনের সেই পাখাগুলোর বেশ কিছু নমুনা এখনও সংগ্রহশালায় রয়েছে। জানা যায়, হেলেন অফ ট্রয়, আইভরি পার্ল ফন্টেজ, ট্রাইফোল্ড-এর মতো প্রায় ৩৫০০ বেশি দুষ্প্রাপ্য পাখা লন্ডনের গ্রিনউইচ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। শুধু বিশ্বের দরবারে নয়, হাতপাখার প্রচলন কিন্তু গ্রামবাংলায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। অতীতকাল থেকে বর্তমানকালেও এই হাতপাখার ব্যবহার রয়ে গিয়েছে। গ্রামবাংলার বেশ কিছু ঘরে আজও নিয়মিত হাতপাখার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অতীতে রাজা-মহারাজাদের রাজপ্রাসাদে কিংবা আদালতে বিচারকের

কক্ষে এই হাতপাখা ব্যবহার করা হতো। ক্লান্ত পথিক, পরিশ্রান্ত শ্রমিক বাড়ি ফিরে হাতপাখার হাওয়া খেয়ে তার ঘর্মাক্ত শরীরকে একটু বিশ্রাম দিত।

গ্রামবাংলার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এবং ব্যবহৃত পাখাটি হলো তালপাতার হাতপাখা। শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে এই পাখা তৈরি করা শুরু হয়। তবে এই পাখাতে শুধু গরম দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয় তা নয়, গ্রামবাংলায় হাতপাখা দিয়ে বিভিন্ন রকম আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। তালপাতার পাখা তৈরি করতে প্রথমে তালগাছের কচি বড়ো বড়ো পাতা কাটা হয়। তারপর সেগুলোকে জলে ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকানো হয়। পাতাগুলো শুকনোর সময় বাঁশ গাছ থেকে বাঁশ কেটে সেখান থেকে ছোটো ছোটো বাঁশের কঞ্চি বের করা হয়। তালপাতা শুকিয়ে গেলে সেগুলোকে সমান মাপ করে ছোটো ছোটো আকারে কেটে নিয়ে তারপর সেই বাঁশের কঞ্চির মধ্যে গেঁথে নানারকম বুনন প্রক্রিয়া দ্বারা এই পাখা প্রস্তুত করা হয়। পাখাটি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে তার উপরে লাল-সবুজ রং দিয়ে কারুকার্য করা হয় এবং সবশেষে যে অংশগুলো অসম সেগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে পাখাটি সমান এবং মসৃণ করে তোলা হয়। তালপাতার পাখা তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু গ্রামের মানুষ নিজের হাতে করে থাকেন।

নকশি পাখা নকশাযুক্ত হাতপাখা এবং লোকশিল্পের অন্যতম উপকরণ। হাতপাখার ব্যবহার বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত, এমনকি এখনও এর বহুল প্রচলন রয়েছে। এ হাতপাখাকে আকর্ষণীয় করার জন্য একে যখন নয়নরঞ্জক নানা নকশায় শোভিত করা হয়, তখনই একে বলা হয় নকশি পাখা।

নকশি পাখার উপকরণ প্রধানত সুতা, বাঁশ, বেত, খেজুরপাতা, শোলা, তালপাতা ও শণ। ময়ূরের পালকের পাখা ও চন্দন কাঠের পাখাও প্রচলিত আছে। ময়ূরের পালকের পাখায় বাড়তি কোনো নকশার দরকার হয় না। নকশি পাখা মূলত চিত্রজ্ঞাপক এবং এতে যে চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয় তার ওপর ভিত্তি করেই এর নামকরণ করা হয়, যেমন: ভালোবাসা, কাঁকইর জালা, গুয়াপাতা, পালংপোষ, শুজনিফুল, বলদের চোখ, শঙ্খলতা, কাঞ্চনমালা, ছিটাফুল, তারাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, বাঘবন্দি, ষোলকুড়ির ঘর, মনসুন্দরী, লেখা, সাগরদীঘি, হাতি-ফুল-মানুষ, গম্বুজ তোলা, পাশার দান, যুগলহাঁস, যুগল ময়ূর ইত্যাদি।

যুগলহাঁস ও যুগল ময়ূরের উল্লেখ আছে কিশোরগঞ্জের একটি মেয়েলি গানে– 'সেই পাংখাত লেইখা গো থইছে আসা আসির জোড়া গো, সেইনা পাংখাত লেইখা গো থইছে মউরামউরীর জোড়া গো।'

নকশার জন্য পাখার উপকরণগুলো বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে নেওয়া হয়। নকশিকাঁথায় যেমন ফোঁড় ব্যবহৃত হয়, নকশি পাখায় তেমনি চেলা ব্যবহার করা হয়। পাখায় রঙের ব্যবহার শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ওপর নির্ভর করে। সুতার পাখার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বুননের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণত বাঁশের হাতলের সঙ্গে বাঁশের গোল চাক বা চটি সংযুক্ত করা হয় এবং চাকে শাড়ির পাড়ের সুতার সাহায্যে টান টান করে পর্দা দেওয়া হয়। এ সুতার ভেতর দিয়ে সুচের সাহায্যে অন্য রঙের সুতা দিয়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা তোলা হয়ে থাকে। অনেক সময় এ ধরনের পাখায় বুননের মাধ্যমে বিভিন্ন ছড়া ও প্রবাদ ফুটিয়ে তোলা হয়, যেমন: 'যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে', 'দিন যায় কথা থাকে, সময় যায় ফাঁকে ফাঁকে' ইত্যাদি।

অনেক সময় বাঁশের গোল চাকতিতে সাদা কাপড় মুড়ে তাতে সূচিকর্মের মাধ্যমে নানান ধরনের ফুল ও লতাপাতা চিত্রিত করা হয়। এ ধরনের পাখায় চতুর্দিকে থাকে লালসালুর ঝালর। এ পাখা গ্রামাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। চট্টগ্রামের সুতার তৈরি নকশি পাখা বেশ আকর্ষণীয়। বাঁশ বা বেতের তৈরি পাখার বুনন পদ্ধতি অনেকটা পাটি বোনার মতো এবং এর আকৃতি হয় গোলাকার বা চারকোণাবিশিষ্ট। বাঁশের ফালি থেকে সরু বেতি

তুলে নিয়ে বুননের মাধ্যমে নকশা তোলা হয়। অনেক সময় বাঁশের বেতিতে বিভিন্ন রং লাগিয়ে বুননের মাধ্যমে চারকোণা, তিনকোণা ইত্যাদি নকশা তৈরি হয় ।

এই পাখা মূলত বাংলাদেশের লোকশিল্প হিসেবে স্বীকৃত। এটি তালপাতা ছাড়াও খেজুরপাতা, শোলা, বাঁশ, বেত, যবের কাঠি এবং ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি করা হয়। কাঠি দেখতে চৌকো হয়। প্রথমে পাতা দিয়ে পাখাটিকে বুনে নেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন রকমের সুতো দিয়ে পাখার উপরে নকশা করা হয়। ফলে, পাখাটি দেখতে কোনোটা লুডুর বোর্ডের মতো হয়, আবার কোনোটা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার হয়। কোথাও কোথাও আবার এই পাখার মধ্যে জোড়া হাঁস, জোড়া ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। নকশি পাখার নকশা অনুযায়ী এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন– শঙ্খলতা, কাঞ্চনমালা, ছিটাফল, মনবিলাসী, পালংপোষ, গম্বুজ তোলা, ১৬ বুড়ির ঘর ইত্যাদি। এই পাখাগুলো দেখতে একটু মজার হয়। সাধারণত হাতপাখার ক্ষেত্রে একটি বড়ো দণ্ড থাকে, যেটা হাতের মুঠোয় ধরে হাওয়া খেতে হয়। তবে ঘোরানো পাখাগুলোর ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়। বাঁশের টুকরো করে সেটিকে ভালো করে পরিষ্কার করে একটি নল আকারে গড়ে নেওয়া হয়। তারপরে এই পাখা দণ্ডটি ঐ বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যে কেউ খুব কম শক্তি ব্যয় করে হাওয়া খেতে পারে। এই পাখাগুলো দেখতে খুব সুন্দর হয়। কাপড়ের ওপর নানারকম কারুকার্য করে বা সেলাই করে পাখাগুলো তৈরি করা হয় এবং তার পাশ দিয়ে কাপড়ের কুচি লাগানো হয়। অনেক সময় শৌখিন ব্যক্তিরা এই সমস্ত পাখাগুলো কিনে ঘর সাজায়।

বর্তমানে প্লাস্টিকের পাখার প্রচলন সবথেকে বেশি। এগুলো বিভিন্ন রঙের হয়। তবে এর মধ্যে কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায় না। এই পাখাগুলো দেখতে খুব সুন্দর হয় এবং নানারকমের

কারুকার্য করা থাকে। কখনও কখনও কোনো সুন্দর দৃশ্য বা ছবি পাখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। পাখাগুলো ছোটো থেকে বড়ো সব আকারের পাওয়া যায়। শুধু বাতাস করার জন্য নয়, এই পাখা ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়।

গ্রামের মানুষ এখনো গরমে হাতপাখা ব্যবহার করে। তালপাতার পাখা এখনো টিকে আছে ঐতিহ্য ধারণ করে। তবে প্রথমদিকের পাখাগুলো ছিল সম্পূর্ণ অংশের। ভাঁজ করা বা ফোল্ডিং পাখা এসেছে অনেক পরে। ইউরোপীয় বণিকরা প্রথম এ ধরনের পাখা নিয়ে আসে চীন ও জাপান থেকে। তখন এসব পাখা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলোয় ব্যবহার করা হতো মণিমুক্তা ও হাতির দাঁত। সোনা-রুপার পাত বসানো হাতপাখাগুলোয় নিপুণ হাতে শিল্পীরা আঁকতেন সেসময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় নানা কাহিনি এবং ফুল-লতাপাতাসহ নানা বিষয়।

নকশি পাখার কদর সেই বেদ পুরাণের আমল থেকেই। রাজা-মহারাজাদের সিংহাসনের দুপাশেও ময়ূরের পালক বা চমৎকার রেশমি কাপড়ের তৈরি পাখা হাতে ডানে-বামে দাঁড়িয়ে বাতাস করত দাস-দাসী।

ইংরেজ আমলে, এমনকি ইংরেজ আমলের পরেও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এ ধরনের পাখা টেনে বাতাস করার ব্যবস্থা ছিল। অষ্টাদশ শতকে বিত্তশালীরা চন্দন কাঠের পাখা ব্যবহার করত, যেটি জলে ভিজিয়ে হাওয়া খেলে চন্দনের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত হতো। ছিল হাতির দাঁতের কারুকার্য করা পাখাও। বিত্তবান লোকের কাছারিঘরে ছাদ বরাবর কড়িকাঠে ঝুলানো থাকত বড়ো কাপড়ের পাখা। রশি টেনে চালানো হতো সেই পাখা।

বর্তমানে হাতপাখা কমই দেখা যায়। তবে গ্রামবাংলায় হাতপাখার কদর এখনো কমেনি। কৃষক মাঠে কাজ করছে, আর স্ত্রী তার জন্য খাবার নিয়ে আসছে। কৃষক খাচ্ছে আর গৃহবধূ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে– এ ছবি যেন মনে দাগ কেটে যায়। সৌন্দর্যের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে রঙিন সুতার 'নকশি পাখা'। সুতা দিয়ে পাখার গায়ে পাখি, ফুল, লতা-পাতা

কিংবা ভালোবাসার মানুষের নাম অথবা ভালোবাসার চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা হয়। পাখার বাতাসে যেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায়, তেমনই বাহারি সব পাখা দেখে চোখও জুড়ায়। একসময় কত রকমের পাখা থাকত বাড়িতে– কাপড়ের পাখা, বাঁশের চাটাইয়ের রঙিন পাখা, তালপাতার পাখা, ভাঁজ পাখা, চায়না পাখা, ঘোরানো পাখা ইত্যাদি।

শীতের মাঝামাঝি সময়েই তালপাতার পাখা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। তালপাতা, বাঁশের কঞ্চি ও সুঁই-সুতা হলো পাখার উপকরণ। প্রথমে তিন-চার ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় পাতা। তারপর সেই পাতাকে সাইজ করে কাটা, সরু লম্বা কাঠি দিয়ে বাঁধা, রং করা প্রভৃতি নানা পর্বের মধ্য দিয়ে পাখা তৈরি হওয়ার পর বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। একটি তালপাতা থেকে একটি বা দুটি পাখা তৈরি করা যায়। তালপাতার পাখা তৈরি ও বিক্রি করে এখনো অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে তালগাছ কমে আসার কারণে শিল্পীর সংখ্যাও কমে আসছে। অন্যদিকে সর্বত্র বিদ্যুতের লাইন যাওয়ায় বাংলার এ জনপ্রিয় লোকশিল্পকর্ম ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। তবে হাতপাখার বাতাস এখনো প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। চিরায়ত বাংলায় হাতপাখা আজও গরমে শরীর জুড়ায়।

গ্রামবাংলার জনপ্রিয় পাখা হচ্ছে তালপাতার পাখা। একটি তালপাতা থেকে একটি মাত্র পাখা তৈরি হয়। পাকা তালপাতা গোল করে কেটে তার চতুর্দিকে বাঁশের সরু চটি দিয়ে বাঁধা হয়। এরপর সরু বেতি দিয়ে ছোটো ছোটো তিন কোণা নকশা তোলা হয়। এছাড়া তালপাতা সরু করে কেটে বুননের সাহায্যে নকশি পাখা তৈরি করা হয়। এ ধরনের পাখা নাটোরে বেশ জনপ্রিয়। বর্তমানে বিভিন্ন লোকমেলায় শোলার তৈরি এক ধরনের পাখা পাওয়া যায়। এ পাখা অত্যন্ত হালকা। শোলা পাতলা করে কেটে একটি কাগজের পাতলা বোর্ডের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে এ পাখা তৈরি করা হয়। শোলার তৈরি পাখায় অনেক সময় রঙের সাহায্যে নানা ধরনের নকশাও ফুটিয়ে তোলা হয়। বিশেষ করে পালা-পার্বণ বা মেলায় এ ধরনের পাখা দেখা যায়।

জায়েদুল আলম: শিক্ষাবিদ ও লেখক, zaidulalam@yahoo.com

স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখি

মেজবাউল হক

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। ঢাকার এক সরু গলিতে হেলে-দুলে হাঁটছে এক তরুণ। চোখ লাল, মুখ শুকনো, হাতে পুরোনো একটি মোবাইল। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছালো গলির মাথায়। পুরোনো একটি বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের ওপর এলিয়ে

দিলো ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে।

তরুণের নাম রাফিন আহমেদ। সবাই তাকে 'রাফি' বলে ডাকে। শহরের নামকরা একটি কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ছিল রাফি। 'ছিল' বলছি, কারণ আজ সে এক নিঃশেষ মানুষের ছায়া।

রাফির জন্ম এক শিক্ষিত পরিবারে। বাবা সরকারি চাকরিজীবী, মা পেশায় শিক্ষক। ছোটোবেলা থেকেই রাফি ছিল হাসিখুশি, প্রাণবন্ত আর পড়াশোনায় আগ্রহী। স্কুলে শিক্ষকরা বলতেন, 'এই ছেলেটার চোখে স্বপ্ন আছে'।

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ– সবকিছুতেই রাফি ছিল সক্রিয়। বাবা-মা ভাবতেন, ছেলে একদিন বড়ো কিছু করবে। কিন্তু জীবন কখনো কখনো অজান্তে অন্য পথ বেছে নেয়।

এক সন্ধ্যায় বন্ধুরা মিলে কলেজের পেছনের মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল। হাসিঠাট্টার মাঝেই এক বন্ধু বলল, 'দোস্ত, একটু ট্রাই করে দেখ না! মাথা হালকা হয়ে যাবে'। রাফি প্রথমে 'না' বললেও তারুণ্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং নতুন কিছু জানার ও অভিজ্ঞতা নেওয়ার তীব্র বাসনা তাকে কৌতূহলী করে তোলে। বন্ধুটি আবার যখন একই আহ্বান জানায়, রাফি তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না।

সেই 'একবার চেষ্টা'ই রাফির জীবন এলোমেলো করে দেয়। অন্ধকার ভবিষ্যতের অতল গহ্বরে ডুবে যেতে থাকে সে। সিগারেট দিয়ে শুরু, পরবর্তীতে গাঁজা, তারপর একসময় হেরোইন। রাফি বুঝতেও পারেনি, কখন তার মস্তিষ্ক ও শরীর পুরোপুরি মাদকের কব্জায় চলে গেল। যে ছেলেটি একসময় বই পড়ার নেশায় রাত জাগত; এখন সে মাদকের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।

কিছুদিনের মধ্যে রাফির অস্বাভাবিক আচরণ ও চলাফেরা বুঝতে পারেন মা। ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় নিজেরও শরীর খারাপ হতে থাকে। একদিন বাবা অফিস থেকে ফিরে দেখেন, রাফির চোখ লাল। তার কথায় এলোমেলো ভাব। তার আলমারিতে রাখা কিছু টাকা উধাও। শুরু হলো সন্দেহ। এ নিয়ে রাফিকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে রেগে আগুন। সংসারে শুরু হয় অশান্তি।

অন্যান্য অনেক দিনের মতো আজও রাতে বাসায় কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে আসে রাফি। গলির মাথায় বাড়ির বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে থাকে। কেউ একজন তার জন্য নেশার বস্তু নিয়ে আসবে। কিন্তু আসে না। কারণ কয়েকদিন হলো বাবা-মা তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধুদের কাছেও চেয়ে পায়নি। যে বন্ধুরা একসময় তার আশপাশে ঘুরঘুর করত, এখন তারাও যেন রাফিকে চেনে না। আর যার আহ্বানে রাফি নেশার জালে আটকা পড়েছিল, সেই বন্ধুটিও যোগাযোগ করে না। চেয়ারে বসেই পাগলের মতো বকতে থাকে রাফি। কারণ মাদকের ক্ষুধা ভালোবাসার চেয়েও প্রবল।

রাফি একটি উদাহরণমাত্র। সমাজে ও দেশে এরকম হাজারো রাফি রয়েছে, যারা অসৎ সঙ্গে পড়ে নিজের জীবন তো নষ্ট করছেই, তাদের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে শত শত পরিবার। ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে হাজারো বাবা-মায়ের স্বপ্ন।

২.

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা বেশি। তাদের কাছে এটি আভিজাত্যের প্রতীক। এগুলো গ্রহণ করে তারা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে চায়। রক্তপ্রবাহে এটির জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এদের প্রদান করে এক ধরনের উষ্ণতা।

মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে যেমন একটি কারণ থাকতে পারে, আবার একাধিক কারণও থাকতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পারিবারিক স্নেহ, আদর, ভালোবাসার অভাব, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক অবস্থাও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে এর প্রভাব ভয়াবহ। কর্মক্ষম নাগরিকের সংখ্যা কমে যায়, সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি জন্ম নেয়। কিশোর বয়সে কেউ মাদকাসক্ত হলে তার সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেকে আত্মহননের পথও বেছে নেয়। সমাজের সম্ভাবনাময় একটি অংশ যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন দেশের জন্যই তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, মাদকাসক্তদের প্রায় ৪৫ শতাংশই কোনো না কোনো সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত।

জনস্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো মাদকাসক্তি। আমাদের দেশে যে হারে তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অত্যন্ত ভীতিকর ও আশঙ্কাজনক। এখনই লাগাম টেনে না ধরতে পারলে সেটা জাতি ও দেশের জন্য ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ডেকে আনবে।

৩.

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কেউ মাদকাসক্ত হয়ে যায়, তার প্রতি ঘৃণা নয়; সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। চিকিৎসা ও পরামর্শের মাধ্যমে তাকে পরিবারে ফিরিয়ে আনতে হবে। সবার আগে পরিবারের ভূমিকা থাকতে হবে। সন্তান কোথায় যায়, কার সাথে মেলামেশা করে– এগুলো খেয়াল রাখা, তাকে বাসায় সময় দেওয়া, কোথাও খেতে ও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, পারিবারিক আবহে তাকে রাখা প্রভৃতি বিষয় নজরে রাখতে হবে। পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। তথাকথিত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের লেজুড়বৃত্তির কবল থেকে ছাত্রসমাজ ও তরুণদের মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আরও ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে; যাতে তরুণসমাজ এসব কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং হতাশাগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পায়।

মাদক শুধু একক কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের সমস্যা নয়, এটি পুরো জাতির অস্তিত্বের হুমকি। একজন মাদকাসক্ত তরুণ হারিয়ে যাওয়া মানে একটি সম্ভাবনা ও একটি ভবিষ্যৎ হারিয়ে যাওয়া। তাই আমাদের সবার উচিত 'না' বলার সাহস তৈরি করা, মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করা। একটি নেশামুক্ত প্রজন্মই গড়ে তুলতে পারে সুস্থ, সচেতন ও সুন্দর সমাজ। যেখানে স্বপ্নগুলো মরবে না, বরং বাঁচবে হাজার আলোর ঝলকানিতে।

মেজবাউল হক: সাব-এডিটর, নবারুণ, ডিএফপি

নীরবে শরীরে বাসা বাঁধে হেপাটাইটিস

মোসা. আলেয়া রহমান

এক সময়ে হেপাটাইটিসের কারণ বিজ্ঞানের কাছে ছিল প্রহেলিকা। ১৯৬৩ সালে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আবিষ্কার করেন জেনেটিক বিজ্ঞানী বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ। তাঁর জন্মদিন ২৮শে জুলাই। তাই এ দিনটি বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস হিসেবে পালন করা হয়। অনেকে বলেন হেপাটাইটিস-এর সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় তিন হাজার বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতায়।

মানুষের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করার অন্যতম অসুখের নাম হেপাটাইটিস বা যকৃতের প্রদাহজনিত অসুখ। কয়েকটি অন্য কারণ ছাড়া হেপাটাইটিস হয় মূলত যকৃত বা লিভারে ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে। হেপাটাইটিস-এ, বি, সি, ডি এবং ই– এই পাঁচটি ভাইরাস চিহ্নিত করা হয়েছে। হেপাটাইটিস এ এবং ই সংক্রমিত হয় দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে। আর হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি সংক্রমিত হয় রক্তের মাধ্যমে। যকৃতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রক্তের লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল শেষ হলে তার অন্তর্গত হলুদ রঙের বিলিরুবিনকে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করা। হেপাটাইটিসের ফলে যকৃতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার জন্য রক্তে বিলিরুবিন-এর পরিমাণ বেড়ে দেহ হলদেটে হয়ে যায়। এই রোগের ক্ষেত্রে লিভার ফুলে যাওয়া, ক্ষুধা কমে যাওয়া, জ্বর, বমি, পেশি ও জয়েন্টে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা যায়। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস রক্ত ও দেহনিঃসৃত তরলের মাধ্যমে ছড়ায়। এই ভাইরাসের উপসর্গ হলো– জ্বর, দুর্বলতা, অবসাদ, ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া, বমি ভাব বা বমি হওয়া। এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে লিভারের রোগ যা লিভার সিরোসিস এবং ক্যান্সারের রূপ নেয়। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিবছর লিভারের এই রোগের কারণে বিশ্বব্যাপী এক দশমিক চার মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। তবে এই রোগ ছোঁয়াচে নয় বলে এর প্রতি মানুষের ভীতিটাও অনেকটাই কম। আমাদের দেশেও চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা হেপাটাইটিস সংক্রমণকে এক নীরব ঘাতক হিসেবে দেখেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে, বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত। বেসরকারি হিসাবে হেপাটাইটিসে প্রতিবছর ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত ব্যক্তির সচরাচর কোনো উপসর্গ থাকে না। অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ, জীবাণুযুক্ত চিকিৎসা সরঞ্জামের ফলে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়। পৃথিবীজুড়ে আনুমানিক এক কোটি মানুষ হেপাটাইটিস সি-তে আক্রান্ত। এই ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ লিভারে ক্ষত এবং বেশ কয়েক বছর পর সিরোসিস সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিরোসিস আক্রান্ত ব্যক্তির লিভার অকার্যকর হয়ে ক্যান্সার বা খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর শিরা বেড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

হেপাটাইটিস ডি রক্ত গ্রহণ, সংক্রমিত সুচ বা শেভিং সরঞ্জামের মাধ্যমে ছড়ায়। এই ভাইরাসে লিভারের সংক্রমণের ফলে বমি ও হালকা জ্বর হয়। হেপাটাইটিস ই ভাইরাস সাধারণত দূষিত খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। এই ভাইরাসের সংক্রমণে রোগীর ক্লান্তি, ওজন কমে যাওয়া, ত্বক ফ্যাকাশে হলুদ হওয়া ও জ্বরের মতো লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসকরা জানান, হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস ছড়ায় মূলত রক্ত এবং মানবদেহের তরল পদার্থের মাধ্যমে। বিশ্বে যত

মানুষের লিভার ক্যান্সার হয় তার ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী হচ্ছে এই হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন ২০ লক্ষ মানুষ লিভার রোগে মারা যায়। হেপাটাইটিস নিয়ে উদ্বেগের সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে, সারা বিশ্বে হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে সংক্রমিত দশজনের নয়জনই জানেন না যে তারা শরীরে এই ভাইরাস বহন করছেন। তাই এটি একটি নীরব ঘাতক। এই হেপাটাইটিস বি এবং সি অনেকটা এইডসের মতো। এটা নীরবে একজন থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ায়। বিভিন্নভাবে যেমন– সেলুনে শেভ করতে গিয়ে ক্ষুর থেকে, সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস গ্রহণ, নাক-কান ফুড়ানো, রক্ত পরিসঞ্চালন, যৌন মিলনের মাধ্যমে সহজে সঞ্চালিত হয়।

যেহেতু রক্তের মাধ্যমে ভয়ংকর এই ভাইরাস সবচেয়ে বেশি ছড়ায়, তাই নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে রক্তদানের আগে যে পরীক্ষা করা হয় সেখানে সবসময় হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস ধরা পড়ে না। এছাড়া বি ও সি ভাইরাস রক্তে সংক্রমণের পর একটা 'অন্তর্বর্তীকালীন সময়' থাকে ২ থেকে ৬ মাস। এ সময়ে সাধারণ রক্ত পরীক্ষায় এ ভাইরাস ধরা পড়ে না। এ সময় কেউ যদি রক্ত আদান-প্রদান করেন তাহলে অগোচরেই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এটি নিরূপণে ডিএনএ ভাইরাল মার্কার বা এইচভিসি টোটাল টেস্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে জেলা-উপজেলা হাসপাতালগুলোতে হেপাটাইটিস পরীক্ষায় এইচভিসি ভাইরাল মার্কার বা এইচভিসি টোটাল টেস্টগুলো করার ব্যবস্থা নেই। এগুলো ছাড়া নিশ্চিত হওয়া যায় না যে রক্তে হেপাটাইটিস ভাইরাস আছে কি নেই। তাই এই প্রাণঘাতী রোগটি নির্মূল করতে চাইলে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের বিকল্প কিছু নেই।

বর্তমানে বি ভাইরাস সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য হলো– শতকরা ৯০ ভাগ রোগীর রোগ নির্ণয় করা এবং কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে শিশু বয়সে এবং মাতৃগর্ভে মায়ের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে খারাপ ব্যাপারটা হলো– শিশুবয়সের সংক্রমণের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু এই জীবাণুটি সারাজীবন বহন করে এবং শতকরা ৫ ভাগ শিশু দূর ভবিষ্যতে যকৃতের ক্যান্সারসহ দীর্ঘমেয়াদি জটিল যকৃতের রোগে ভোগে। শিশুদের এত বেশি দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণের কারণ হলো– জরায়ুতে থাকা অবস্থায় অনবরত ভাইরাসের মুখোমুখি হওয়া এবং দুর্বল, ক্লান্ত ইমিউন প্রতিক্রিয়ায়। মায়ের শরীরে যত বেশি ভাইরাল লোড হয়, বাচ্চার সংক্রমণের হার তত বেশি হয়। প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে প্রবল ইমিউন প্রতিক্রিয়া হয়, যকৃত স্বল্পকালীন সময় অল্প থেকে মাঝারি আকারের আঘাত পেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এপোপটসিস ও সাইটোকাইনের মাধ্যমে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রমিত কোষগুলো ধ্বংস করে ফেলে এবং উলটো শরীরের মধ্যে এইচবিভি প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। তবে দুর্বল ক্লান্ত ইমিউন প্রতিক্রিয়ার কারণে এদের মধ্যেও শতকরা মাত্র ৫ ভাগ মানুষ দীর্ঘমেয়াদি এই ভাইরাসটি বহন করে এবং কেউ কেউ যকৃতের জটিলতার সম্মুখীন হন। বাচ্চার জন্মের পূর্বে মায়েরা চিকিৎসকের কাছে অ্যান্টিনেটাল চেকআপের জন্য আসেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান হলো– শতকরা মাত্র শূন্য দশমিক ৪ ভাগ (বাংলাদেশে শতকরা ৩ দশমিক ৫ ভাগ) গর্ভবতী মা এই ভাইরাসটি বহন করছে।

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে এই ভাইরাসের টিকা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে আমরা অচিরেই মুক্তি পাব। হেপাটাইটিস বি-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পর পর এবং চতুর্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ দিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ শিশুর হেপাটাইটিস বি টিকা নিশ্চিত করতে চায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। নবজাতক শিশুকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস প্রতিরোধে বার্থ ডোজ দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টার্গেট অনুযায়ী লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ কাজ করছে। হেপাটাইটিস রোগ নিয়ে সরকার অত্যন্ত সচেতন। এ রোগের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা আছে। সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত টিকা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জনসচেতনতা সৃষ্টিতে চালানো হচ্ছে প্রচারণা।

লিভার সতেজ রাখতে ফাইবার, ফোলেট, ভিটামিন এ, সি, বি৬– এসব অবশ্যই রাখবেন। এছাড়াও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, ফল, শাকসবজি, টমেটো, পালং শাক, ব্রকোলি, মিষ্টি আলু, স্ট্রবেরি বা ভিটামিন সি জাতীয় ফল, কমলা লেবু, কলা, খেজুর, টকদই এসব রাখুন রোজের ডায়েটে। এছাড়াও গোটা শস্য অবশ্যই খান। ওটস, ডালিয়া, বিভিন্ন শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখবেন ডায়েটে। রোজ একমুঠো করে কুমড়ো বীজ, সূর্যমুখীর বীজ এবং চিয়া সিডস খাওয়া দরকার। এছাড়াও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান। আর তাই লিভারের সিরোসিস হলে এমন কিছু খাবার খান যার মধ্যে প্রোটিন বেশি থাকে। এসব ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। পানি, ডাবের পানি এসব রোজ বেশি পরিমাণে খান। ব্ল্যাক কফি খান দুধ-চিনি ছাড়া। তবে ঠান্ডা পানীয়, কার্বোনেটেড পানীয় এসব এড়িয়ে চলতেই হবে। এছাড়াও মিষ্টি দেওয়া খাবার, আইসক্রিম, ফলের রস, অ্যালকোহল এবং বেশি কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন। মশলাদার, তৈলাক্ত খাবার, প্যাকেটজাত খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে থাকুন। যেখানে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে সেই সব খাবারও একেবারেই নয়। কারণ এতে রক্তচাপ বাড়ে, রক্ত জল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা সিরোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। পরিবর্তে লবণ ছাড়া রান্না খান।

গর্ভবতী মাসহ সবার এইচবিএসএজি (HBsAg) টেস্ট করানো উচিত। পজিটিভ হলে নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা দরকার। নেগেটিভ থাকলে প্রয়োজনে অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল (anti HBC total) এবং প্রয়োজনে অ্যান্টি এইচবিএস (anti HBs) টেস্ট করা দরকার। উপরিউক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেগেটিভ থাকলে অবশ্যই এইচবিভি টিকা প্রদান প্রয়োজন। এইচবিভি সংক্রমণ জটিলতা শুরু করে দিলেও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসায় কার্যকরী নিরাময় হয়।

মোসা. আলেয়া রহমান: প্রাবন্ধিক

মায়ের দুধ পান সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ

কামরুল ইসলাম

মাতৃদুগ্ধ শিশুর প্রথম টিকা এবং সর্বোত্তম পুষ্টির উৎস। মায়ের দুধ শুধু শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে না বরং সুস্থ, সক্ষম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। নবজাতকের জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই, বিকল্প নেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশেও। মায়ের দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য– 'মাতৃদুগ্ধকে অগ্রাধিকার দিন, টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলুন'।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি তাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়, তবে মৃত্যু ঝুঁকি ৩১ শতাংশ কমে যায়। আর ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ (এক ফোঁটা পানিও নয়) খাওয়ানো হলে শিশুমৃত্যুর হার আরও ১৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে 'শালদুধ' (কলা বা হলুদাভ গাঢ় দুধ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু পুষ্টিকরই নয়, বরং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং প্রথম টিকার মতো কাজ করে। এই সময়টিতে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশে মায়ের দুধ অপরিহার্য।

বিশ্বজুড়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়। লক্ষ্য শিশুদের সুস্থভাবে বড়ো করে তোলা, মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং মাতৃদুগ্ধের বিকল্প বিপজ্জনক পণ্য থেকে দূরে রাখা।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ অথবা বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ একটি বার্ষিক উদ্‌যাপন, যা প্রতিবছর পৃথিবীর ১২০টিরও বেশি দেশে ১ থেকে ৭ই আগস্ট পালন করা হয়। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোয় উৎসাহ দিতে এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এই কর্মসূচি। ডব্লিউবিডব্লিউ (WBW) ওয়েবসাইটের ২৬শে আগস্ট ২০১০-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ৭৯টি দেশের ৪৮৮টি সংস্থা এবং ৪০৬,৬২০ জন অংশগ্রহণকারী বিশ্বব্যাপী ৫৪০টি কর্মসূচির আয়োজন করে।

১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশন (ডব্লিউএবিএ) 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' পালন করেছিল এবং বর্তমানে ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং তাদের অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তি, সংস্থা ও সরকার দ্বারা ১২০টিরও বেশি দেশে এটি পালন করা হয়। বিশ্বব্যাপী বুকের দুধ খাওয়ানোর চর্চা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র স্তন্যদানের জন্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ডব্লিউএবিএ গঠিত হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ২৫শে আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২৫' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং মার্কিন শিশুরোগবিদ্যা অ্যাকাডেমি (এএপি) বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ এটি মা আর শিশু উভয়ের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। উভয়ই ছ'মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে এবং এর পর দু'বছর বা তারও বেশি বয়স পর্যন্ত পরিপূরক খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় প্রায় তিন দশক আগে, যার ভিত্তি 'ইনোসেন্টি ডিক্লারেশন' (Innocenti Declaration) নামের একটি স্মারকলিপি। এটি তৈরি করে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ১৯৯০ সালে সে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে বিভিন্ন দেশের সরকার, ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচওসহ অন্যান্য সংস্থা। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ এই ইনোসেন্টি ঘোষণার স্মরণার্থে উদ্‌যাপিত হয়।

বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ প্রকৃতপক্ষে সচেতন করার একটি বড়ো পদক্ষেপ। মায়েরা যাতে সচেতন হয়ে শিশুদের ঠিকমতো স্তন্যপান করান সেজন্য উৎসাহ প্রদান করা এই সপ্তাহের অন্যতম গুরুত্ব। মাতৃদুগ্ধ শিশুদের পক্ষে কত উপকারী সে বিষয়ে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রতিটি মায়ের থাকা ভালো। বুকের দুধ খাওয়ানোর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে কারণ এটি মা এবং শিশু উভয়ের জন্যই উপকারী। এটি শিশুদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং হাঁপানির মতো পরবর্তী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর ঝুঁকি কমাতে পারে। বলা হয় যে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের জরায়ু সংকোচন এবং প্রসবের পরে রক্তপাত দ্রুত বন্ধ করতে সাহায্য করে। এটি স্তন এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায়। মা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে। নবজাতকের পুষ্টির সর্বোত্তম উৎস হলো মায়ের দুধ। মায়ের দুধে বিভিন্ন উপাদান থাকে যা শিশুদের সংক্রমণ এবং রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। বুকের দুধে থাকা প্রোটিন শিশুর পক্ষে ফর্মুলা বা গরুর দুধে থাকা প্রোটিনের তুলনায় সহজে হজম হয়। তদুপরি, মায়ের দুধে পাওয়া ক্যালসিয়াম এবং আয়রন আরও সহজে শোষিত হয়।

বেশির ভাগ নবজাতকের জন্য, বুকের দুধ পুষ্টির সর্বোত্তম উৎস। শিশু বড়ো হওয়ার সাথে সাথে তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য মায়ের বুকের দুধ পরিবর্তিত হবে। বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুদের কিছু তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। যেসব শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় তাদের হাঁপানি, স্থূলতা, টাইপ-১ ডায়াবেটিস এবং হঠাৎ শিশু মৃত্যু সিন্ড্রোম (SIDS) হওয়ার অশঙ্কা কম থাকে। বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুদের পেটের রোগ বা কানের সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। শিশুটি মায়ের দুধের মাধ্যমে মায়ের কাছ থেকে অ্যান্টিবডি গ্রহণ করে। এই অ্যান্টিবডিগুলো শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে এবং রোগ থেকে তাদের রক্ষা করে। মায়েরা যে-কোনো জায়গায় এবং যে-কোনো সময় দুধ পান করাতে পারেন; বোতল বা মিল্ক ফর্মুলা তৈরি না করেই, মায়েরা তাদের শিশুদের চলতে চলতে দুধ খাওয়াতে পারেন। ভ্রমণের সময় বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুদের জন্যও আরামের কারণ হতে পারে যাদের নিয়মিত সময়সূচি ব্যাহত হয়। বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের ডিম্বাশয়, স্তন এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে, পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপও কমে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মায়ের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, কিছু নির্দিষ্ট ক্যান্সার এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা কম থাকে। তাই, বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ প্রচারণায় নারীদের তাদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য শিক্ষিত এবং সহায়তা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সকলকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

কামরুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম ৪ঠা আগস্ট ২০২৫ তথ্য ভবনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিএফপি আয়োজিত প্রকাশনা উৎসব ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন— পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম (আগস্ট-২০২৫)

গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের আত্মত্যাগ এবং তাঁদের স্বপ্নের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ

জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা ২০২৫-এর অংশ হিসেবে ৪ঠা আগস্ট ২০২৫ তথ্য ভবন প্রাঙ্গণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনা নিয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) আয়োজিত 'প্রকাশনা উৎসব ২০২৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের আত্মত্যাগ এবং তাঁদের স্বপ্নের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। সেই স্মৃতি জাতির সামনে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। আমরা চেষ্টা করছি তাদের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বই প্রকাশ ও চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পর্যায়ে বহুমাত্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাটি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে প্রামাণ্যচিত্র, বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা ও সৃজনশীল কাজ চলছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং শহিদদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠবে।

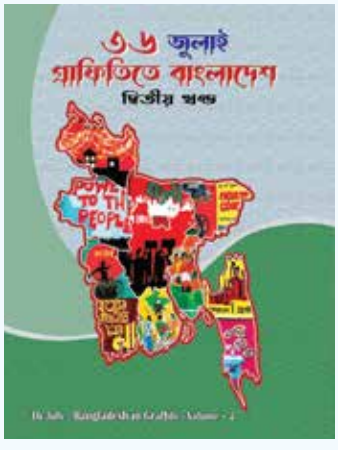

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম জানান, ডিএফপির নিজস্ব বাজেট এবং চলতি অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দ থেকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও গবেষণাধর্মী বই প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে 'গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ' শীর্ষক বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলছে।

ডিএফপি মহাপরিচালক খালেদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামুল কবীর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফায়জুল হক, পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি। মোড়ক উন্মোচনের পর উপদেষ্টা প্রকাশনা উৎসবের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে প্রকাশনা তৈরি এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ডিএফপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ইতোমধ্যে ৯টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বেশকিছু প্রকাশনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম ৩১শে আগস্ট ২০২৫ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনাসমূহের পাঠক প্রিয়তা যাচাই ও মান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ক গবেষণাপত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন— পিআইডি

গণ-অভ্যুত্থানের ওপর অঙ্কিত গ্রাফিতি-বিষয়ক সচিত্র অ্যালবাম '৩৬ জুলাই: গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ-এর ১ম ও ২য় খণ্ড' ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাডহক প্রকাশনার আওতায় শ্রাবণ বিদ্রোহের প্রিমিয়ার শো-এর প্রচারণার জন্য ২০০০ কপি পোস্টার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা ও ডিজাইন মোতাবেক ১০টি ভিন্ন ক্যাটাগরির ৪ লক্ষ কপি পোস্টার, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার কপি পোস্টার মুদ্রণ, বিতরণ ও প্রদর্শন করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে ইংরেজি ভাষায় ২৮০০ কপি পোস্টার মুদ্রণ, বিতরণ ও বিদেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ: জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা ২০২৫-এর অংশ হিসেবে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলন নিয়ে

'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ৫ আগস্ট ২০২৫' শীর্ষক বিশেষ ক্রোড়পত্র ১৭২টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও বিদায় সংবর্ধনা: ১২ই আগস্ট, ২১শে আগস্ট ও ২৭শে আগস্ট অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণসূচিতে সরকারি কর্মচারী আইন ২০২৫, নথিখোলা ও শ্রেণিবিন্যাস, নথি ব্যবস্থাপনা, ছুটি বিধিমালা, সম্পাদনার কৌশল ও প্রুফরিডিং, প্রেস রিলিজ ও ভাষণ লেখা, অডিট জবাব লিখন সংক্রান্ত গ্রুপওয়ার্কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১২ই আগস্ট প্রশিক্ষণ শেষে দুজন কর্মচারীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিএফপির গবেষণাপত্রের মোড়ক উন্মোচন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) প্রকাশনাসমূহের পাঠক প্রিয়তা যাচাই ও মান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ক গবেষণাপত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম। ৩১শে আগস্ট ২০২৫ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গবেষণাপত্রের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মোড়ক উন্মোচনকালে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, ডিএফপির প্রতিষ্ঠাকাল অর্থাৎ ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ডিএফপির প্রকাশিত সব ধরনের প্রকাশনা সংরক্ষণ করতে হবে। যেসব প্রকাশনা বর্তমানে ডিএফপির সংগ্রহে নেই, সেসব প্রকাশনা দ্রুত সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে। উপদেষ্টা ডিএফপির প্রকাশনার মানোন্নয়নে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। গবেষণাপত্রের মোড়ক উন্মোচনের সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, ডিএফপির মহাপরিচালক খালেদা বেগম এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য কাজের বিবরণ

বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা (এবিসি) শাখায় নিরীক্ষায় সংবাদপত্র হাজির হয়েছে ৪১টি। নতুন মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ১টি। নিরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নপত্র জারি করা হয়েছে ৩০টি। বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ১টি। ৮ম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করায় নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র জারি ৬টি। মিডিয়া অন্তর্ভুক্তির জন্য ১টি সংবাদপত্র অফিস পরিদর্শন এবিসি শাখার। এবিসি শাখার ৯৩টি সংবাদপত্র অফিস নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শন।

প্রতিবেদন: কে সি বি তপু

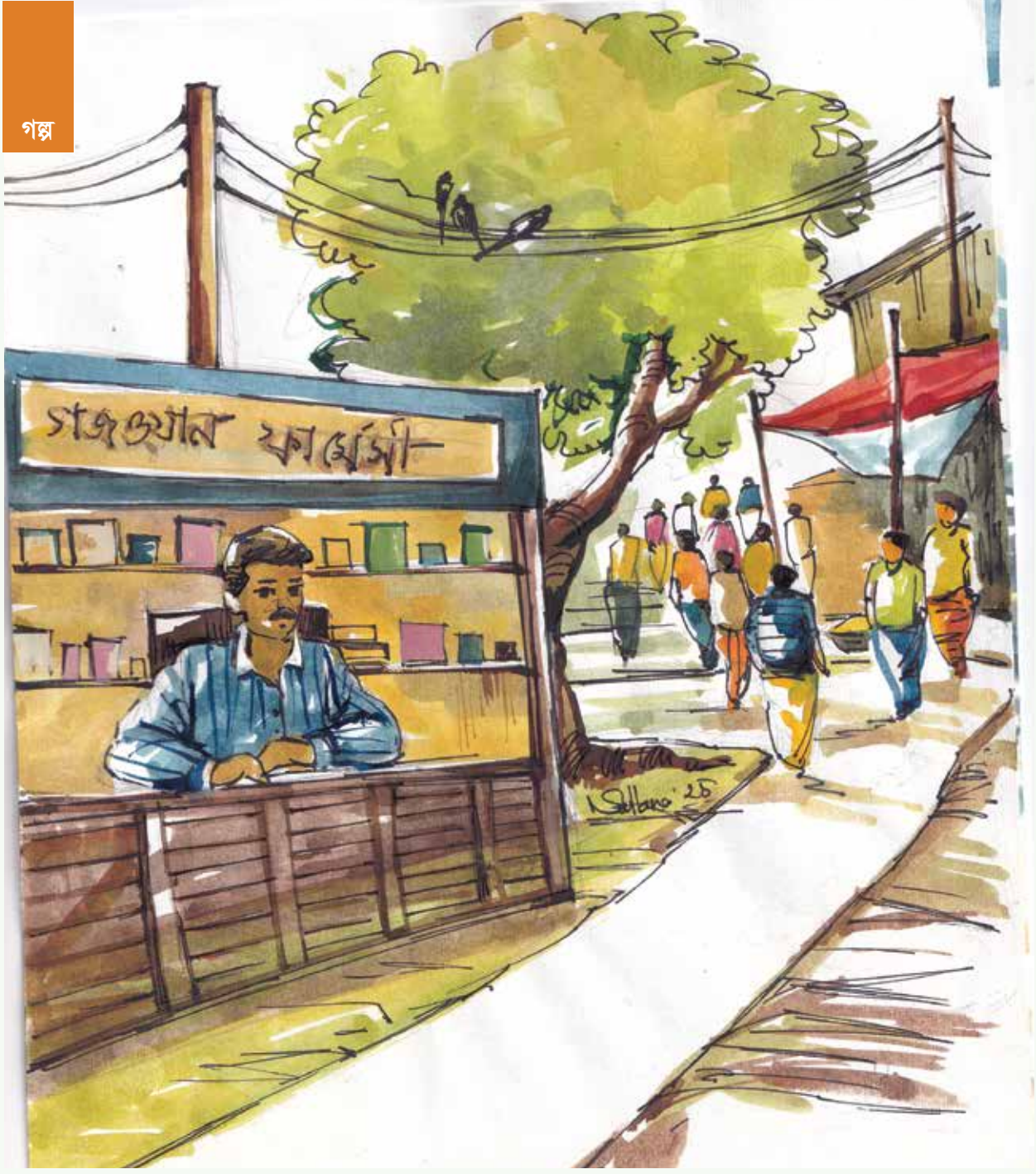

গজওয়ান ফার্মেসি

জুয়েল আশরাফ

– গজা ভাই, এই ওষুধটা আছে? শুধু চার নম্বরটা লাগবে।

গজওয়ান সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। না, ক্রেতার দিকে নয়, দোকানের পাশে ঝোলানো সাইনবোর্ডটার দিকে। মনে মনে হিসাব মেলালো, নাম ঠিকই আছে তো? বোর্ডে লেখা, গজওয়ান ফার্মেসি। ডা. গজওয়ান, এল.এল.এম.এফ, পল্লি চিকিৎসক।

আচ্ছা, যে নামটা সে নিজের হাতে কালো রঙে লিখে টাঙিয়েছে, তাও কি ভুল হবে? এভাবেই কিছু কিছু লোক তার নামটাকেও বিকৃত করে। গজওয়ানকে 'গজা ভাই' বলে ডাকলেই গজওয়ানের ভেতরে হালকা একটা ধক করে ওঠে, যেন কেউ তার পেশাদারিত্বে চুন্নি মেরে গেল। সে প্রতিশোধ নেয়। সরাসরি নয়, ধীরে, ঠান্ডা মাথায়। যেমন আজ ক্রেতাকে সে কিছুটা দেরি করাবে। 'চার নম্বরটা লাগবে' এটা তার আত্মাভিমানে হালকা একটা আঁচড়। তবু মুখে কিছু বলল না। কারণ সে জানে, রাগে চড়লে আর ব্যবসা থাকে না।

দোকানটা খুব বড়ো নয়। একটা পাঁচ ফুট বাই ছয় ফুটের ঘরে মাথা নোয়াতে হয়, তাও মাথা ঠুকে যায় মাঝে মাঝে। দেয়ালে পুরনো ক্যালেন্ডার, মোটা দড়িতে ঝোলানো স্টেথোস্কোপ, আর

এক কোণায় প্লাস্টিকের জারে ইনজেকশন রাখার ব্যবস্থা। দুইজন কর্মচারী। রিপন আর সজীব। সজীব আবার কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে ক্লাস মিস করে এখানে বসে। গজওয়ান ওদের দুজনকে আলাদা কাজে লাগায়। একজন ওষুধ ধরবে, আরেকজন ইনজেকশনের সময় রোগীর হাত চেপে ধরবে।

আজ গজওয়ানের এক হাতে ফোন, অন্য হাতে ইনজেকশন। মোবাইলটা সে ঘাড়কাত করে কানের মাঝে চেপে ধরে রেখেছে।

– হ, হ ... কালকেই কইলাম না আপ্নেরে... থাইকা যান! আমি আইছি কই?

ইনজেকশনটা ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে রোগী 'হা-আ-আ-আ' করে ওঠে।

– চুপ করেন তো, কাঁদেন ক্যান? কাল আবার আইবেন, একটা ফুঁড়ি দিব। পরশু থাইকা এক্কেবারে ফিট।

মুখে হাসি, গলায় ঠান্ডা কর্তৃত্ব। মোবাইল বন্ধ করে ক্রেতার দিকে তাকালো।

– এই যে ভাই, আপনি কইছিলেন চার নম্বর? প্রেসক্রিপশন দেন দেখি।

গজওয়ান ভুরু কুঁচকে প্রেসক্রিপশনের দিকে তাকায়। চোখের কোণায় বিরক্তি, ঠোঁটে সামান্য ভাঁজ।

– ডাক্তার যে ওষুধ লিখছেন, ওটা নাই। কিন্তু ঐ কম্পোজিশনেরই একটা ভালো কোম্পানির ওষুধ আছে। হইব।

ক্রেতা কিছু বলার আগেই সে উঠে দাঁড়ালো। সজীবকে বলল, একটা 'অক্সিজিনল-৪০০' দে। ঐটা এনএস-৪ এর সমমান।

ক্রেতা কিছুটা অস্বস্তিতে বলল, ভাই, এইটা আমি চিনি না। আমার বউয়ের জন্য লাগবে, বাচ্চা দুধ খায়।

গজওয়ান গম্ভীর হয়ে ওঠে। চেয়ারটা টেনে একটু সামনে চলে আসে।

– শোনেন ভাই, আমি আপনারে ঠকাইতাছি? আমি কি গলি ঘুপচির মোড়ের মুচির দোকানদার? না, আমি গজওয়ান। এই যে এই দোকান, ২০০৮ সাল থাইকা দাঁড়ানো। অল্প কয়জন এই এলাকায় এমন টিকছে।

তার কথায় একটা নাটকীয় দৃঢ়তা। পাশের দোকানের দোকানদার মালেক ভাই এমন সময়ে কানে ফিসফিস করে, আহা, গজা ভাই আবার পুরান কথার কিতাব খুলছে।

গজওয়ান হঠাৎ নীচু স্বরে বলল, আপনার জায়গায় যদি কেউ হয়, আমি ওকেও একই ওষুধ দিতাম। বিশ্বাস রাখতে হয়, বুঝলেন?

গজওয়ান এই জায়গায় আজ চার বছর। এলাকার ছোটোখাটো

সমস্যার ডাক্তার সে। দাঁতে ব্যথা, গায়ে ফোঁড়া, মাথা ধরলে সবকিছুর একটাই ঠিকানা, 'গজা ভাই'।

তবে গজওয়ানের মধ্যে একটা বদল আসছে। সেটা কেউ বোঝে না। সে নিজেও প্রথমে বুঝতে পারেনি। গজওয়ান মাঝে মাঝে নিজেকে আয়নায় দেখে চমকে ওঠে। কে এই মানুষটা? চুলে পাকা, মুখে কালো দাগ, চোখের নীচে গর্ত। সে কি ডাক্তারের মুখ, নাকি ডিগ্রিবিহীন এক প্রবঞ্চকের মুখ?

একদিন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছে গজওয়ান। হঠাৎ মোবাইলে একটা ভিডিও খুলে দেখে 'ফার্মেসি ফ্রডস ইন রুরাল বাংলাদেশ'। ভিডিওতে দেখানো হয়, কীভাবে গ্রামের অর্ধশিক্ষিত ঔষধ বিক্রেতারা ভুল ওষুধ দিয়ে রোগীদের ক্ষতি করে। একটা দৃশ্যে গজওয়ানের মতো একটা দোকান। একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ ফুলে গেছে ইনজেকশনের রিঅ্যাকশনে। পাশে মা কাঁদছে। দোকানের মালিক পালিয়েছে। গজওয়ান হঠাৎ ভিডিওটা বন্ধ করে দেয়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। সে কি নিজের মতো কাউকে দেখল?

সেদিন রাতে সে ঘুমাতে পারে না।

পরদিন সে দোকানে আসে কিছুটা দেরি করে। রিপন জিজ্ঞেস করে, গজা ভাই, শরীর খারাপ নাকি?

– না, মানে, ঘুম হয়নি।

এলাকায় নতুন একজন সরকারি হেলথ ইন্সপেক্টর এসেছেন। গুজব রটে গেছে, সব ফার্মেসি চেক হবে। লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ইনভয়েস সবকিছু। গজওয়ান চুপচাপ বসে থাকে। এক সময় বলল, সজীব, অই পুরান রেজিস্ট্রারটা বাইর কর তো। সজীব খুঁজে খুঁজে বের করে আনে। পাতাগুলো ভাঙা, লেখা অস্পষ্ট।

– রিপন, তোর মোবাইলে গুগলে সার্চ কর তো, 'NS-4 এবং Oxizenol-400 কম্পোজিশন সেম নাকি?'

রিপন একটু পর বলল, হ, ভাই, প্রায় মিল আছে। কিন্তু এক্সিপিয়েন্ট আলাদা।

– মানে?

মানে, গায়েবি পার্ট যা রোগী বুঝবে না, কিন্তু রিঅ্যাকশন করতে পারে।

গজওয়ান মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকে। তার কাঁধ কেমন ঝুলে পড়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বয়স্ক নারী দোকানে আসে। সঙ্গে একটা কিশোর ছেলে। ছেলেটার মুখ ফোলা, চোখ লাল।

– এই যে গজওয়ান ভাই, আপনে যে ওষুধ দিছেন, খাইছে আর ওর অবস্থা খারাপ।

– আমি দিছি? কী দিছি?

– এই দেখেন, এই গুলা। তিনটা ওষুধ। খাওয়ানোর পর থেকে জ্বর, গা গরম, মুখ ফুলে গেছে।

গজওয়ান একদম স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ওষুধগুলোর গায়ে চোখ বুলায়। শেষেরটার নাম দেখে তার মাথায় একটানা ঘণ্টা বাজে, 'ডেসেক্লাফিন-১০০' এইটা সে কখনো দেয় না। ওটা রিপন দিয়েছিল। সে কিছু বলে না, কিন্তু ওষুধগুলো নিয়ে তার স্টকে মিলিয়ে দেখে। ওটা তারা রেগুলার রাখেই না। এইটা অন্য কেউ দিয়েছে? রিপন চুপ করে। সজীব চোখ ফিরিয়ে রাখে। গজওয়ান হঠাৎ নিজের গলা খোঁচাতে খোঁচাতে উঠে দাঁড়ায়।

– আপ্নারে দেইখা মনে হইতেছে... ছাওয়ালডা আমার ওষুধ না খাইলে আরও বিপদ হইত!

মা চমকে যায়।

– কী কইলেন?

গজওয়ান গম্ভীর গলায় বলল, কিছু মানুষ ফার্মেসি চালায় না, ব্যবসা করে। আমি দুইটা মুরগি বেচা লোক, কিন্তু মানুষ মারি না।

নারী কিছু বোঝে না। কিন্তু গজওয়ান তখন দোকানের পেছনে রাখা পুরনো সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ফেলছে। পরদিন থেকে সেই বোর্ডটা আর ঝুলে না। জায়গায় আসে নতুন সাদা বোর্ড, গজওয়ান ঔষধ ভাণ্ডার। ডিগ্রিবিহীন, দায়িত্বপূর্ণ। ইনজেকশন শুধু এমবিবিএস-এর পরামর্শে।

রিপন আর সজীবকে বসিয়ে সে বলে, আগামী হইতে ইনজেকশন বন্ধ। আর কোনো প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দিও না। রোগী গেলে বলবা, আগে সরকারি হাসপাতালে যান।

সজীব মুখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

– তখন তো আমাদের বিক্রি কমে যাবে ভাই।

– তাতে সমস্যা নাই। আমার নাম থাক, বদনাম না।

২

দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে গজওয়ান চুপচাপ বিড়ি টানছে। এক সময় তার এই অভ্যেসটা ছিল না। ওষুধের দোকান চালায়, তাই ভাবত, ধোঁয়াজাত কিছু মুখে নিলে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু আজকাল বিড়ি না টানলে সন্ধ্যার ভেজা বাতাস গায়ে হুল ফুটায়।

আজ চারদিন, সে একটাও ইনজেকশন দেয়নি। তার বদলে গজওয়ান এখন বেশি সময় দেয় একটা খাতা নিয়ে বসে থেকে। খাতাটার নাম দিয়েছে সে, 'চিকিৎসার খরচা-পত্তর'। প্রতিদিন কার কী প্রেসক্রিপশন এলো, কী ওষুধ পাওয়া গেল, আর কী ছিল না সব টুকে রাখে। লোকজন দেখে ভাবছে, এই বুঝি সরকারে ঢুকেছে গজওয়ান।

একদিন মালেক ভাই পাশে বসে হেসে বলল, গজা ভাই, কাহিনি কী? ডায়েরি লিখতাছেন?

– এই যে মালেক ভাই, আমি তো আর ফার্মাসিস্ট না, আমি পাপ মোচনের চেষ্টা করতাছি।

– ঐটা আবার কেডা দিছে?

গজওয়ান বিড়ির ছাই ঝাড়ে। তারপর বলে, আমি নিজেই।

মালেক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তয় এখন লোকজন কিন্তু অভিযোগ করতাছে। কয়, আগে গজওয়ান ভাই ব্যথার ইনজেকশন দিত, ফুড়ি দিত, সারা হইতাম। এখন কয়, সরকারি হাসপাতালে যান। ওখানে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ায়ে ডাক্তার দেখা লাগে।

গজওয়ান গলায় একটু বিরক্তি মেশায়, ওইটুকু লাইনে দাঁড়ানোর কষ্টে যদি মানুষ বাঁচে, তয় দাঁড়াক না? আমি তো আর ডাক্তার না। একটা ভুল ইনজেকশনে যদি কারো রিঅ্যাকশন হয়, আমি দায় নেব?

– তয় সরকার কি টাকা দেয়?

এই কথা গজওয়ান চুপচাপ শুনে নেয়। এরপর বলে, দেয় না। কিন্তু দেয় না বলেই তো আমি ঠিক থাকতে চাই।

মালেক আর কথা বাড়ায় না। ও চলে গেলে গজওয়ান বিড়ির শেষটুকু ছুড়ে ফেলে দেয়, ঠিক সাইনবোর্ডটার নীচে।

পরদিন সকালে এলাকায় হুলুস্থুল পড়ে যায়। উপজেলা হেলথ ইন্সপেক্টর আসবেন। গুঞ্জনটা অনেকদিন ধরেই ছিল, এবার সত্যি। লোকটার নাম জিল্লুর রহমান। সরকারি চাকরিতে ঢুকে তিন বছরেই বদলির রেকর্ড গড়েছেন। যেখানেই যান, সোজা গিয়ে বলেন, 'আমি কোনো তদবির শুনি না'। তবে তদবিরই যে বাংলাদেশের বাতাসে মিশে আছে, সেটা জিল্লুর সাহেব এখন বুঝছেন।

গজওয়ান দোকানে বসেই ছিল, এমন সময় জিপ থেমে গেল সামনে। একটা খাকি রঙের গেঞ্জি গায়ে সরকারি তেজ নিয়ে নেমে এলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

– এই দোকান কার?

– আমার।

– আপনার কি ফার্মাসিস্ট লাইসেন্স আছে?

– না। আমি ডাক্তারও না। তাই এখন প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দিই না।

জিল্লুর সাহেব থমকে গেলেন। এমন জবাব সাধারণত মফস্বলে মেলে না। একটা খাতা টেনে নিয়ে বললেন, এই খাতা কীসের?

– প্রতিদিনের প্রেসক্রিপশন রেকর্ড। কার কী চাহিদা, আমি কী দিতে পেরেছি, টুকে রাখি।

খাতাটা উলটেপালটে দেখলেন ইন্সপেক্টর। হাত থামল এক জায়গায়, 'রাশিদা বেগম NS-8 না পেয়ে সমান কম্পোজিশনের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। রোগী সন্তুষ্ট।' আরেক পাতায়, 'সজীব ভুল ইনজেকশন দিয়েছিল। রোগীকে বিনা খরচে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।' ইন্সপেক্টরের চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি জ্বলে উঠল।

– আপনি তাহলে স্বঘোষিত হলেও দায় নিচ্ছেন?

– আগে নিইনি। এখন নিচ্ছি। কারণ আমার নাম আছে। বদনাম রাখতে চাই না।

জিল্লুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর মৃদু হেসে বলেন, আমার রিপোর্টে এই দোকানের নাম থাকবে। তবে নেগেটিভ না।

গজওয়ান বিস্ময়ে তাকায়।

– আপনাদের মতো লোক কম। রীতিমতো কিছু ঔষধের দোকান আমি আজ সিল করেছি। ইনজেকশন দিচ্ছে ক্লাস এইট পাস ছেলে। কিন্তু আপনি..., আপনি বদলেছেন।

গজওয়ান ধীরে মাথা ঝাঁকায়। বলে, আমারও ভয় করে এখন। ভয়টা ভালো, না?

দোকানের বাইরে এখন একটা নতুন ব্যানার লাগানো, 'গজওয়ান ঔষধ ভাণ্ডার: ওষুধের আগে বিবেক।' মানুষ প্রথমে সন্দেহে পড়ে। 'গজা ভাই পাগল হয়ে গেছে' এই কথা চলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রটে যায়, এই দোকানে ভুল ওষুধ পাওয়া যায় না। গজওয়ান কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, কিন্তু জোর করে কিছু দেয়ও না। কাউকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন আনিয়ে তবে ওষুধ দেয়। না থাকলে সরকারি হাসপাতালে যেতে বলে।

একদিন এক ভিখারি এসে বসে গজওয়ানের দোকানের এক কোণায়।

– গজা ভাই, ইনজেকশন দিতে পারবা?

– প্রেসক্রিপশন?

– কীসের প্রেসক্রিপশন! তনুর ব্যথা ধরছে। আপনার ইনজেকশনেই তো ভালো হয়।

গজওয়ান হেসে উঠে দাঁড়ায়।

– তনু তোমার বউ?

– না, হাঁস।

– হাঁসের ইনজেকশন, আমি কি ভেটেরিনারি ডাক্তার?

ভিখারি হেসে গড়িয়ে পড়ে। আর আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও হাসে। গজওয়ান নিজে হাসে না। কিন্তু তার চোখের কোণায় এক ধরনের শান্তি জমা হয়।

৩

শুক্রবার দুপুরবেলা। মসজিদের পাশে একচিলতে ছায়ায় দাঁড়িয়ে গজওয়ান ঘাম মুছে। আজ তার দোকান বন্ধ। কারণ আজ সে ডাক্তার না, আজ সে অভিভাবক। তার ছোটো মেয়ে রুবাইয়া প্রথমবার শহরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। একদিন সে বলেছিল, আব্বু, আমি মেডিকেলে পড়তে চাই।

তখন গজওয়ান কিছু বলেনি, শুধু মেয়েটার মাথায় হাত রেখেছিল। আজ তার সেই অভিমানী হাতখানা মেয়ের ব্যাগে ইনহেলারের পকেটে সেঁধিয়ে গেছে। রুবাইয়া চলে গেলে সে দোকানের চাবিটা টেনে নামিয়ে দেয়, নীচের টুলটায় বসে পড়ে।

এমন সময় একজন লোক এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, গজা ভাই, জলদি যান! তালুকদারদের ওখানে কেরোসিন খেয়ে এক মেয়ে গলায়!

গজওয়ান আঁতকে ওঠে।

– কে?

– আপনের সেবিকা লাকীর ছোটো বোন।

সে কথা আর না বাড়িয়ে দৌড়ে চলে যায়। তালুকদারদের বাড়ির উঠোনে মেয়েটা পড়ে আছে। মুখে ফেনা, নিশ্বাস নেই বললেই চলে। চারদিকে লোক জড়ো হয়েছে, কেউ অ্যাম্বুলেন্স ডাকেনি। গজওয়ান নীচু হয়ে দেখে মেয়েটার ঠোঁটের কোণে কেরোসিনের গন্ধ। সে জানে, এই পর্যায়ে কেবল অক্সিজেন নয় সরাসরি IV দিতে হয়, আর কয়েকটা life-saving injection, যেগুলোর নাম সে জানে মুখস্থ, কিন্তু ডিগ্রি না থাকায় দেবার অধিকার নেই তার।

পাশ থেকে কেউ বলে, গজা ভাই, ইনজেকশন দেন! আপনি না দিলে ও মরবে!

গজওয়ান কাঁপতে থাকে। হাত ঠান্ডা, চোখে তীব্র আতঙ্ক। তার ভেতরের দুটি গলা তখন দুই দিকে টান দেয়। একটা বলে, তুমি পারো, তুমি তো বহুবার দিয়েছ। আরেকটা বলে, তুমি দোষী হবে। তুমি আজ নীতির পথে হেঁটে এসেছ। এখন পেছনে যেও না। তার ভেতরে সেই বিতর্ক থেমে যায় মেয়েটার মা কেঁদে ওঠার শব্দে।

গজওয়ান উঠে দাঁড়ায়।

– আমি দিতে পারি। কিন্তু এখনো যদি কেউ অ্যাম্বুলেন্স না ডাকে, তয় আমি কিছুই করব না।

একটা ছেলে ফোনে ডায়াল দেয়। গজওয়ান তখন ব্যাগ থেকে নিজের রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, ইনজেকশন, গ্লাভস বের করে নেয়। তার হাতে এখন আর বাজারি বিড়ির গন্ধ নেই, আছে একরাশ পবিত্র ভয়। সে চোখ বন্ধ করে বলে, বিসমিল্লাহ।

সন্ধ্যায় মেয়েটা বেঁচে যায়। হাসপাতালে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। রাতে থানা থেকে এক লোক আসে গজওয়ানের দোকানে।

– আপনার নামে রিপোর্ট এসেছে। অবৈধভাবে ইনজেকশন প্রয়োগ করেছেন।

গজওয়ান চুপচাপ মাথা ঝাঁকায়।

ইনজেকশন আমি দিয়েছি। আমি মিথ্যা বলব না।

ওসি বলে, তবে এই এলাকাতেই আজ চারজন সাক্ষ্য দিয়েছে, আপনার ইনজেকশন না দিলে মেয়েটা মরেই যেত।

– তাতে কী? আইন তো আইন।

ওসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আপনার মতো লোকরে আমরা হেনস্থা করতে পারি না। কিন্তু আপনার নামে যে লাইসেন্স নাই, সেটা সত্য।

– ঠিক আছে। আমি দোকান বন্ধ করব।

ওসি একটু এগিয়ে এসে ধরা গলায় বলে, আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও নাই, গজওয়ান ভাই। বরং আমি অনুরোধ করব, আপনি আপনার মেয়েকে যদি সত্যি ডাক্তার বানাতে পারেন, তাহলে এই দোকানের সাইনবোর্ড একদিন পালটে দেবেন।

গজওয়ানের চোখ ছলছল করে ওঠে।

৪

দশ বছর পর, এক দুপুরে তালুকদারদের নতুন বাজারের মোড়ে নতুন একটা ঝকঝকে দোকান। রুবাইয়া মেডিসিন কর্নার। MBBS, Govt. Medical, Batch-28। ভেতরে সাদা অ্যাপ্রোন পরে দাঁড়িয়ে আছে রুবাইয়া। তার পেছনের চেয়ারে এক বয়স্ক লোক বসে। তার গায়ে অ্যাপ্রোন নেই, চোখে চশমা, মুখে একরাশ শান্তি। লোকজন এখনো তাকে 'গজা ভাই' বলে ডাকে।

এক বৃদ্ধ এসে বলে, গজা ভাই, আপনার মেয়েটা তো আসলেই ডাক্তার হইছে!

গজওয়ান হেসে বলে, হ, এখন সত্যিকারের ডিগ্রিও আছে, দায়ও আছে।

বৃদ্ধ বলে, তয় আপনি আগেও ভালো ডাক্তার ছিলেন। হুনছি, সেই কেরোসিন খাওয়া মেয়েটাও এখন নার্সের ট্রেনিং নিচ্ছে।

গজওয়ান তাকিয়ে থাকে রুবাইয়ার দিকে, যে এখন প্রেসক্রিপশন দেখে মাথা নাড়ছে, ভুল ওষুধ বাতিল করছে। তার চোখের কোণায় তখন আলো জমে। সে জানে, জয় না ডাক্তারির, না ব্যবসার। জয় বিবেকের।

———— ○ ————

না ভোলার কাব্য

ফারহানা আলী মিষ্টি

ইদানীং আমি খুব সহজেই ভুলে যাই।
চশমাটা খুলে রেখেছি কোথায়!!!
চাবির গোছাটা, চেকের পাতাটা,
মেয়ের জুতোটা, ছেলের খাতাটা,
কর্তার দেওয়া জরুরি কাগজ
কোথায় রেখেছি তুলে!!!
আমি বেমালুম যাই ভুলে।

'ফ্রি হয়ে কল দেবো'–
কাকে যেন বলেছিলাম ফোনে,
আর কিছুতে পড়ে না মনে!!

কী যেন করব ভেবে,
কী যেন বলব ভেবে,
ভেবে ভেবে রেখে সব
ভুলে যাই নিজে,
আমি খুঁজতে খুঁজতে ভুলি
খুঁজতেছি কী যে!!

অথচ কোন দূর, কোন সে পূর্বযুগে...
কার কোন কথা কবে
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে,
মন কবে কেঁদেছিল কার করা অপমানে!!

কোন পথে বিঁধেছিল
কবে চোরা-কাঁটা পায়ে,
ভেঙেছিল বুক কবে
কার কী কথার ঘায়ে!!

কবে কোন প্রতারণা ভেঙেছিল বিশ্বাস,
সেই কবে কার বুকে ছিল বিষ নিশ্বাস।

এতকিছু ভুলে যাই, থাকে না তো মনে কিছু,
ব্যথা পাওয়া স্মৃতিগুলো কখনো ছাড়ে না পিছু।
ভুলে যাওয়া স্বভাবেও জমে থাকে স্মৃতিভার,
এত ভাবি ভুলে যাব, ভোলা তো হয় না আর!!

তিনিই সে নজরুল

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

দুঃখ নিয়ে জন্মেছিলেন তাই হয়েছেন দুখু
তাঁর জীবনে সুখ ছিল না সামান্য এইটুকু।

কিন্তু ছিল সাহস অতি
শাসককুলের অসঙ্গতি
এড়ায়নি তাঁর চোখ
প্রত্যাশা তাঁর জেগে উঠুক ঘুমন্ত সব লোক।

তাই ছড়িয়ে দ্রোহবাণী
স্বজাতিদের দুঃখ-গ্লানি
করতে মোচন তিনি
কাব্য-গানে বিদ্রোহী সুর বাজান প্রতিদিনই।

দুখু মিয়া সাম্যবাদের গান-কবিতা লিখে
মানবতার মহৎ বাণী ছড়ান দিকে দিকে।

সেই বাণীতে উদ্দীপনা
সবার মনেই শুদ্ধিপনা
তৈরি হওয়ার পর
ভড়কে গেল সব বেনিয়া ব্রিটিশ মাতব্বর।

তাই গিয়েছেন কারাগারে হননি তবু ভীত
বন্দি হয়ে গেয়ে ওঠেন বিদ্রোহী সংগীতও
দুখু মিয়া নামটি হলেও দুঃখজয়ের গানে
উদ্দীপনা ছড়ান তিনি সবার প্রাণে প্রাণে
ফোটান তিনি সম্ভাবনার সুগন্ধি এক ফুল
দুখু মিয়ার অন্তরালে তিনিই সে নজরুল।

অস্তিত্বহীন

অদ্বৈত মারুত

ভালোবাসা চেতনার মতো অস্থির– বলেছিলে
তাকে ধরা যায় না; কেবল ছোঁয়া যায় অনুভবে
প্রতিটি নিশ্বাসে থাকে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণ।

চলে গিয়েছ বলেই হয়ত প্রথম অনুভূত হলো
অনুপস্থিতি কীভাবে ঢেকে ফেলে
একেকটি পূর্ণতা– ভাঙন থেকে ভাঙন।

হয়তবা কেউ কাউকে ভালোবাসিনি–
শুধু শূন্য হয়েছিলাম পরস্পর
মাঝখানে দাঁড়ানো ছিল আকাঙ্ক্ষার আগুন।

অনেক দিন পর আজ আয়নার দিকে তাকাই
তোমার মুখের বদলে ভেসে ওঠে কিছু মুহূর্ত
তাতে আমি'র অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না।

প্রিয় কবি নজরুল

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

প্রেমের কবি! দ্রোহের কবি! মানবতার কাণ্ডারি!
জাতি-ধর্মে ভিন্নতা চূর্ণিতে আঁধারে দিয়েছ পাড়ি।
সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠিয়া গেয়েছ সাম্যের গান,
চিত্তবীণায় সুরে ঝংকারে হয়ে আছ মহীয়ান!

ধর্মান্ধতায় কুঠারাঘাতে মানুষে দিয়েছ স্থান,
বলেছ এক বৃন্তে কুসুম হিন্দু আর মুসলমান।
তুমি ছিলে নব দিগন্তের আলোকিত নবধারা,
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তুমি তুলেছ তুমুল সাড়া।

অগ্নিবীণার ঝংকারে ঘুঁচো দাসত্বের অপমান,
অধীনতার শিকল ভেঙে করো মুক্তি আহ্বান।
তুমি আগ্নেয়গিরির অগ্নি চেতনার মহাবীর!
অন্যায় তুমি কর ছারখার নত নাহি কর শির!

তুমি রণবীর! ধূমকেতু! বুলেটের বিস্ফোরণ!
মহাসিন্ধুর প্রলয় আঁকি! রুধির রুদ্ধ স্খলন।
ভণ্ডামিতে করেছ আঘাত সততাকে ঊর্ধ্বে রাখি,
দুর্দান্ত সাহসে রেখে গেছ সুন্দরের চিত্র আঁকি।

তুমি চির দুর্জ্জয়! নির্ভীক! দুর্বার! মহা কল্লোলী!
তুমি পথশিশু! যাযাবর! খরসান কথাকলি।
সংকীর্ণ ভ্রূকুটি ছিন্নে তুমি দিয়েছ প্রেম-প্রণয়,
তোমার ঔদার্যে নারী পেল তার প্রতিভার জয়।

আকাশে-বাতাসে চুমে আজি তোমার চরণ ধূলি,
যুগ-যুগান্তে রবে অম্লান তোমার মহিমা গুলি।
সাম্যের কবি! প্রেমের কবি! তুমি বিদ্রোহী অনন্য,
তব কীর্তির আভাতে আজি নিখিল ভুবন ধন্য!

ঝাঁক ঝাঁক আবাবিল

কামাল হোসাইন

সেদিন সমস্ত অহংকার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল,
যেন আকাশের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো অদৃশ্য বজ্রের স্বর,
ধ্বংসের ভাষা তখনো কেউ শিখে ওঠেনি,
তবু পৃথিবী মুখস্ত করছিল তার প্রতিটি শব্দ।

মেঘের গায়ে রক্তরঙা দাগ,
বাতাসে ভাসমান ক্রন্দনধ্বনি।
শহরের প্রতিটি দরজায় ঝুলে ছিল নীরবতা,
প্রতিটি দেয়ালে ছিল দুঃশাসনের চিহ্ন।

১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট–
এই তারিখগুলো কেবল সময়ের নয়,
এগুলো দুঃস্বপ্নের মাপজোক,
যেখানে ঘড়ির কাঁটাও থেমে গিয়েছিল
অনেকের নিঃশব্দ আর্তনাদে।

তারপর হঠাৎ–
আকাশ থেকে নেমে এলো ঝাঁক ঝাঁক আবাবিল।
তাদের ডানায় আলো ছিল না, ছিল না আগুন–
ছিল এক অদ্ভুত কোমলতা,
যেন তারা ধ্বংসের বুক চিরে
জন্ম দিতে চায় করুণার এক নতুন পৃথিবী।

দুনিয়ার আরেক আবরাহা তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল নিজেই নিজের ছায়ায়,
তারই প্রাচুর্যের প্রাসাদে ধরেছিল প্রথম চিড়,
আর আয়নাঘর ভেঙে ভেঙে ফেলছিল নিজেরই প্রতিবিম্ব।
তার সব মহিমা মিশে গেল ধুলোয় ধূসরিত হয়ে,
সব শাসন নত হলো এক বিন্দু আলোর সামনে।

তবু কোনো এক সাহসীর মুঠোয় ছিল একটিমাত্র পালক–
সেই আবাবিলের,
যে ফিরে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে।
হয়ত সেই সাহসীই প্রার্থনা জানিয়েছিল,
যেন এই প্রজন্ম গনগনে আগুনের মধ্যেও শিখে নেয় ফুল ফোটানোর মন্ত্র।

আমি হতে চাই

ওমর ফারুক নাজমুল

আমি হতে চাই সক্রেটিস, প্লেটো, ওমর খৈয়াম
বিশ্বসাহিত্যে ছড়িয়ে যাবে আমার সে সুনাম।
আমি হতে চাই শিল্পী জয়নুল, এস এম সুলতান
চারুকলায় আনব বয়ে বাংলাদেশের মান।
আমি হতে চাই ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, ভাস্কোদা
দেখব ঘুরে সাগর, মরু-পার হব নর্মদা।
আমি হতে চাই পর্বতারোহী, এভারেস্ট করব জয়
সেই খবরটা ছড়িয়ে যাবে সারা বিশ্বময়।
আমি হতে চাই রোনালদো, পেলে, মেসি, ম্যারাডোনা
দেশের গৌরব আনব বয়ে ঘোচাবো বঞ্চনা।
আমি হতে চাই সিন্দাবাদ ও কলম্বাসের মতো
আমার জাহাজ ঢেউ পেরিয়ে ছুটবে অবিরত।
আমি হতে চাই আব্বাস উদ্‌দীন, ফকির লালন সাঁই
নতুন গানের সুরে সবার মন ভরাতে চাই।
আমি হতে চাই ধ্রুবতারা, আকাশ, রাঙা আলো
পুব দিগন্তে ছড়িয়ে আভা ঘুচিয়ে দিব কালো।
আমি হতে চাই সুপারম্যান, এক তুখোড় স্পাইডার
ভাঙব সকল বাধার প্রাচীর, নশির অন্ধকার।

চিঠির অপেক্ষায়

তারিকুল আমিন

ফিরতে চিঠির অপেক্ষায় বেলকনির পাশে
পথ চেয়ে থাকি রোজ—পোস্টম্যান কাকু বাড়ির পাশ দিয়ে
দ্বিচক্রযানে নিত্য করে আসা-যাওয়া
এই হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার রাখলি না আর খোঁজ।

পোস্টম্যান কাকুর দ্বিচক্রযানের ডিং ডিং শব্দ
প্রেমের শহরে সাইরেন বাজে; সকাল, সন্ধ্যা, রাতে
বেলকনির পাশে বসে অপেক্ষমাণ- তোর চিঠির আশায়
বাসা বাঁধে মনের ঠিকানায়; তবে প্রতিবারেই হই আশাহত।

তোর চিঠির উত্তরের অপেক্ষায়, প্রহরগুনি রোজ
নিত্যনতুন পত্র পাঠাই, নেই প্রিয়তমার খোঁজ
তোর সেই ভুবনতরীর ঠিকানায়, ফিরতি চিঠির আশায়
আমার হৃদয়ের কথামালা ভরে দেই পোস্টম্যানের ঝুলিতে
কারণ মন শুনতে চায়, তুই যেন বলিস আমায়
হ্যাঁ, আমার ভুবনতরীর হাসি তুমিই! তুমি আমার প্রিয়তম!

সব গিয়েছে ফুরিয়ে প্রেমের চোরাবালিতে
ফিরতি খাম খুলে দেখি পুরোটাই সাদা...?
অপেক্ষায় আছি প্রিয়তমা, থাকব অপেক্ষাতে
লিখব চিঠি তোমায়, ফিরতে চিঠির আশায়...!

ডাকছে মহাকাল

শামীম শাহাবুদ্দীন

আগের দিনের মধুর পরশ নেই তো গ্রামে আর
বাপ-দাদাদের ভিটে মাটি করছে হাহাকার!
গোলা ভরা ধান নেই এখন, মাছ থাকে না খালে
যায় না শোনা পাখির কুজন গাছের ডালে।

গাঁয়ের মেয়ে কলসি কাখে যায় না পুকুর ঘাটে
ছেলেপেলে শট দিয়ে বল খেলায় না আর মাঠে
গোল্লাছুট ও কানামাছির দিন হয়েছে ফিকে
এসব খেলায় যায় না পাওয়া গাঁও গেরামের ঝিকে।

দাদা-নাতির হাস্যরসও পড়ে না আর চোখে
পাড়ায় পাড়ায় 'গপ্পো' করার ছল ভুলেছে লোকে
পুকুরপাড়ে জোলাভাতির কই হারালো রীতি
চাঁদনী রাতে চাটাই পেতে হয় না গাওয়া 'গীত'-ই।

ভোরবেলাতে লাঙল কাঁধে যায় না চাষি মাঠে
মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান বসে না আর হাঁটে
হালের গরু খামারে আজ নেই তো গোয়াল ঘর
কলের গাড়ি চাষ করে খেত সারাটি বছর।

হাডুডু বা ডাংগুলি খেল ভুলেই গেছে কবে
খালেবিলে সাঁতারের রেস আর কখনও হবে?
গভীর রাতে মাচায় বসে হয় না তো আর কথা
আজ মানুষের মাঝে কেবল চরম নীরবতা।

রুটিন করে হয় না যাওয়া পাড়া-পড়শির বাড়ি
ময়-মুরুব্বি পোলাপানকে দেয় না জোরে ঝাড়ি!
কুতকুতি আর বউচি খেলার দিন হয়েছে গত
জোয়ান বুড়ো এখন অ্যাপে খেলছে অবিরত।

বদলে গেছে জীবনযাপন বদলে গেছে হাল
নতুন দিনের বার্তা নিয়ে ডাকছে মহাকাল।

সুখ

আবু বাকার

অনেকটা সময় কেটে গেল। কখনও নিজের দিকে তাকাইনি। ঘরের মানুষটার সাধ আহ্লাদের খোঁজও নেইনি কোনোদিন। পঁয়তাল্লিশ বছর একসাথে আছি।

কয়েকদিন আগে ঈদ হয়ে গেল। না, কোনো মেহমান আসেনি। নতুন জামা-কাপড় পরতে হয়নি আমাদের। শেষ কবে ঈদের কেনাকাটা করেছি, মনে করতে পারব না। এসবে আমার তেমন তাগিদ নেই। যা করার ঘরের মানুষটি এ যাবৎ করে এসেছে। ঘর-সংসার যেমন গুছিয়েছে, তেমনি দু'দুটি সন্তানকেও জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। ওরা নিজের জগতে সুখেই আছে। চেষ্টা করে আমাদেরও সুখে রাখতে।

কীসে সুখ, সুদীর্ঘকাল হিসেব কষে দেখিনি। খেয়ে-পরে শান্তিতে বাঁচাই যে আনন্দের– এটা বুঝতেই কাটিয়ে দিয়েছি সারাজীবন।

আত্মজা দু'দণ্ড প্রশান্তির জন্য আমাদের একবার নিয়ে গিয়েছিল পাহাড় ও ঝরনার পাদদেশে। সিলেট জয়ন্তিয়া পর্বতমালায় এর আগে একা একা ছুটে এসেছি জীবিকার তাগিদে। কিন্তু পাহাড়-ঝরনা অবলোকনের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এবার সেটা সঙ্গীকে নিয়ে উপভোগ করার সুযোগ এলো।

পিয়াইন নদীর সবুজাভ স্বচ্ছ পানিতে ভেসে যাওয়া পাথর-নুড়ির চমৎকার দৃশ্য দেখে মন জুড়িয়ে যায়। নদীর উপর দূরে ঝুলন্ত ডাউকি সেতু খুবই দৃষ্টিনন্দন। উঁচু উঁচু পাহাড়ে তাক বেঁধে বসতি আবাস ও ফাঁকে ফাঁকে আকাশে সাদা মেঘের ভেলা জাফলংকে পর্যটকদের চোখে মোহনীয় করে তোলে। তামাবিলের প্রবহমান স্বচ্ছ সলিলা নদীর ধারা দেখে মন জুড়িয়ে যায়। মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ও ঝরনা দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হই।

আকাশজুড়ে নানা প্রজাতির পাখি মনের আনন্দে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য দেখে অভিভূত আমরা। স্বচ্ছ পানিতে জেলেদের মাছধরা আর দুইপাশে খাসিয়া কিশোর-কিশোরী ও রমণীদের জলক্রীড়ার অপূর্ব দৃশ্য ভোলার নয়। খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মনোরম পরিবেশ না দেখলে অনুভব করা যাবে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে রয়েছে সুউচ্চ ঝরনা। পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা স্বচ্ছ পানির প্রবাহ বিছানাকান্দিকে করেছে মনোমুগ্ধকর। পাহাড়, নদী, ঝরনার সম্মিলিত ও প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য বিছানাকান্দির গর্ব।

মেঘালয় পর্বতমালার পূর্বদিকে জয়ন্তিয়া পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে লালাখান থেকে অনেক কিলোমিটার নদীর পানির রং পান্না সবুজ। এত স্বচ্ছ পানি দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়।

জীবনের চড়াই-উতরাইও যে কত মধুর এর আগে টের পাইনি। ঝরনা, পাহাড় আর চা বাগানের প্রকৃতি বেষ্টিত হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর লালমাটিতে এর আগে অনেকটাকাল বসবাস করেও অনুভব করতে পারিনি এর মাহাত্ম। ব্যস্ত জীবন আর অবসর জীবনের অনুভবে যোজন যোজন পার্থক্য।

পাঁচতারা বনেদি খণ্ডকালীন আবাসে তিনদিন ও রাতের স্নিগ্ধ আবেশে চমৎকার সময় কাটালাম। এটাই বোধ করি সুখ। তাহলে ধরে নেওয়া যায় প্রতিদিন এমন অবস্থায় যাদের দিনাতিপাত তারাই সুখী। আসলে কি তাই? বিত্ত, বৈভব, সম্পদ ও অর্থশালী হলেই সুখী হওয়া যায়? প্রাচুর্যের বল্গাহীনতা কি অনুভূতিকে আচ্ছাদিত করে রাখে না?

জীবন শুধু ব্যস্ততারই নয়, আহরণ করার মতো বিনোদনও প্রয়োজন। অবসর জীবনে এসে এটাই উপলব্ধি করতে পারছি।

পাহাড় ও ঝরনা দেখার পর সমুদ্রের বিশালতা চিনিয়ে দিতে আত্মজা হঠাৎ হাওয়ার মতো ঝটিকা সফরে নিয়ে গেল একদিন কক্সবাজার। অনেক স্বপ্ন, অনেক গল্পগাথা এবার বাস্তবে অনুভূত হলো। আয়োজনবিহীন অনাড়ম্বর যাপিত জীবনে এমন ঘটনা কল্পনাহীন ছিল। সেটাও পূর্ণ হলো আমাদের। এটাই বোধ করি সুখ। রিসোর্টে ঢুকতেই তাজা ফুল আর পাতায় বানানো মালা দিয়ে বরণে মনটা আনন্দে ভরে যায়। অভ্যর্থনাকারী আন্তরিকতা নিয়ে প্রাথমিক কাজ শেষ করে স্বচ্ছ সাজানো গ্লাসে ডাবের পানিতে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। তারপর বুফেতে প্রাতরাশ। সে এক এলাহি কাণ্ড। খিচুড়ি, লুচি-পরোটা, ডিম ভাজা, তাজা ফলের রস, নানা ফল, পিঠা আর সেই সাথে তরমুজ, শশা, পেঁপে ও গাজরের জুস। চাইলে দুধ খাওয়া যাবে। দুপুর আর রাতের খাবার পছন্দমতো তালিকা দেখে বেছে নিতে হবে। সামুদ্রিক মাছ, নিরীক্ষা ধর্মী খাবার, ভাতের সাথে নানা ভর্তা, ভাজি, ডাল সবই ইচ্ছেমতো খাওয়া যাবে। রাজকীয় প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্ন ও রাতের এমন খাবার অনাস্বাদিত ছিল জীবনে।

চারদিন-চাররাত মারমেইড বিচ রিসোর্টে অনন্য সময় কাটল। কটেজের সামনেই সমুদ্রসৈকত। জোয়ারে জলরাশি উঠোন ছুঁই ছুঁই করে। দূরে মাঝে মাঝে জেলেদের সাম্পান নজরে আসে। ভাটার সময় অনেক দূরে সরে যায় জলরাশি। মাঝখানে তখন বালুচর চোখে পড়ে। তখন হেঁটে হেঁটে অনেকটা বালু মাড়িয়ে ঘুরে আসি।

উঠোনের পাশেই ডিম্বাকৃতি চমৎকার আসন। তিন-চারজন বসে গল্প করা যায়। সেখানে বসে কথা বললে গমগম করে ওঠে। আত্মজা মাঝে মাঝে গান গাইত। মনকাড়া সুন্দর আবহ অনুভব করতাম সেই গানে।

মনের মতো করে মাকে পুতুলের সাজে রাঙিয়ে তুলেছে আত্মজা। সৈকতে জলরাশির স্পর্শে সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় যেন নতুন জীবনের বারতা বয়ে আনত।

ঝাউবনের পাশ দিয়ে সমুদ্রসৈকত আর পাহাড়বেষ্টিত পেঁচারদিয়া গ্রামটি দ্বীপের মতো হলেও মাঝখান দিয়ে ৮৪ কিলোমিটার কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ সড়ক। এই মেরিন ড্রাইভ সড়কের পশ্চিম পাশে খেজু খালের পাশে এই মারমেইড বিচ রিসোর্ট। সবুজে ঘেরা রিসোর্টে ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ছোটো-বড়ো বেশকিছু দৃষ্টিনন্দন কুটির। ইয়োগা সেন্টার, স্পা, নৌকা ভ্রমণ ও পরিবেশবান্ধব চমৎকার এক অবকাশযাপন আলয়। বনেদি আবাসের মতো যাবতীয় সুবিধা রয়েছে কটেজগুলোতে। বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০টি কটেজ আছে এই রিসোর্টে। লতাগুল্মে ভরা ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো চমৎকার কটেজ। বিশাল এলাকাজুড়ে মারমেইড বিচ রিসোর্ট। কক্সবাজার শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ক ধরে এগিয়ে গেলেই মিলবে এই রিসোর্ট।

সমুদ্রসৈকত ধরে প্রায় চার কিলোমিটার জলরাশি স্পর্শ করে ছুটে চলছিল সিএনজি। সমুদ্রের পানি ছিটকে গায়ে এসে পড়তে সেকি আনন্দ ঘরের মানুষটার। জলরাশির উপর দিয়ে সারাটা পথ শিশুর মতো খিলখিল করে হাসছিল। রিসোর্ট থেকে পড়ন্ত এক বিকেলে ইনানী সৈকতে যেয়েও মানুষটার হাসির ফোয়ারা থামে না। সৈকত ঘেঁষে তিন চাকার বিশেষ যানে চেপে প্রায় ২ কিলোমিটার সমুদ্রসৈকত মনের আনন্দে আমরা ঘুরে বেড়ালাম।

এ কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে। ভাগ্যিস আত্মজা আমাদের অপূর্ণতাকে ভরিয়ে তুলতে সৈকত পাড়ে নিয়ে এসেছে। পড়ন্তবেলায় এ আমাদের কাছে বড়ো প্রাপ্তি। মনের আনন্দ খুঁজে ফেরার সময় এর আগে না ঘটলেও এখন আমরা পরিতৃপ্ত। এটাই আমাদের সুখ।

ঈদে নতুন জামা গায়ে না পরলেও আত্মজার দেওয়া দু'দুটি পাঞ্জাবি এখনও পাট ভাঙা হয়নি। ঘরের মানুষটাও বছর দুই আগে পাওয়া ভারতের কাঞ্চিবরণ, মাইশুর সিল্ক শাড়ি এখনও গায়ে চড়ায়নি। চেন্নাই ভ্রমণের সময় পুত্রবধূ শাশুড়িকে উপহার দিয়েছিল। অনেকটা লটারি পাওয়ার মতো আকাশপথে ভারত ভ্রমণের টিকিট পাঠিয়েছিল ছেলে। গবেষণা কাজে ভারতে দুমাস অবস্থান করবে সপরিবার। তাদের ইচ্ছা কাছে থেকে আমাদের সান্নিধ্য নেবে। প্রায় ১২ বছর দেশ ছাড়া। এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়?

আত্মজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যালিকা ফাতেমাকে বাসায় রেখে আমরা নির্ধারিত ফ্লাইটে কলকাতা হয়ে চেন্নাই ভ্রমণ করেছিলাম। সেই প্রথম ঘরের মানুষটা উড়োজাহাজে চড়েছিল। জানালায় আকাশ থেকে সবকিছু ছোটো ছোটো দেখে শিশুর মতো আনন্দ অনুভব করেছে। তা দেখে আমারও ভালো লেগেছিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কলকাতায় নেতাজী সুভাষ বসু বিমান বন্দরে প্লেন নামে। এরপর বিকেলে কলকাতা থেকে আবার প্লেনে চেন্নাই রওয়ানা দেই। প্রায় দুঘণ্টা অন্ধকারের পৃথিবী আকাশ থেকে দেখার চেষ্টা করলাম আমরা। এটাও এক রকম ভালো লাগা।

চেন্নাই এয়ারপোর্টে পৌঁছুতেই শুভ ওর মাকে জড়িয়ে স্বাগত জানালো। দীর্ঘকাল পর মা-ছেলের এমন একান্ত সান্নিধ্য দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল আমার। সড়ক পথে প্রায় দুঘণ্টা গাড়িতে পাড়ি দিয়ে ম্যাথম্যাটিকস ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্স রেস্ট হাউজে পৌঁছুতেই নাতি দৌড়ে এসে কোলে উঠল। আধো আধো বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলতে থাকে। অনেককাল অপেক্ষা শেষে নাতিকে কাছে পেয়ে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। এরপর ফ্রেশ হয়ে রেস্ট হাউজ ক্যাফেতে সবাই রাতের খাবার খেলাম।

চেন্নাই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে সিরোসেরি কমপ্লেক্সে অবস্থিত চেন্নাই গাণিতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি একটি শিক্ষা ও গবেষণা শিক্ষালয়। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। গণিতশাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের গবেষণাসহ পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান ও সাংগঠনিক বিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়। প্রতিষ্ঠানটি বীজগাণিতিক জ্যামিতির ওপর গবেষণার জন্য বিখ্যাত।

চারদিন রেস্ট হাউজে নাতির সাথে বেশ ভালো সময় কাটালাম। সাড়ে চার বছরের নাতি তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার উদ্ভাবিত অস্থায়ী তাবু দেখিয়ে কী খুশি। একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ যেন সম্পাদন করেছে। তার সংগ্রহের নানা জিনিস দেখিয়ে আধো আধো বাক্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এরপর নাভানুর এলাকায় এক ফাইভ স্টার গোকোলাম পার্ক হোটেলে রাজকীয়ভাবে নাতিকে নিয়ে ছয়দিন ছিলাম। সমস্ত দিন আমাদের সাথে আনন্দ আড্ডা আর মা-বাবার সাথে কমপ্লেক্স রেস্ট হাউজে রাত্রিযাপন। হোটেলে সকালের নাস্তা বুফে স্টাইলে নানা আয়োজন। বিভিন্ন ফলের জুস, ডোসা, খিচুড়ি, পরোটা, ভাজি, ডিম ও মিষ্টি। যতটা ইচ্ছা পেট ভরে খাও। দুপুরের খাবার হোটেলে না খেয়ে সড়কের বিপরীতে ওভারব্রিজ পার হয়ে এক রেস্তোরাঁয় কেরালা পরোটা আর খাসির ভুনা মাংসের স্বাদ ভোলার নয়। নাতিরও কেরালা পরোটা খুব পছন্দ। নিজের হাতে ছিড়ে কত না মজা করে তা খেয়েছে সে।

এরপর কানাথুর এলাকায় জুহু সমুদ্রসৈকতের পাশে আনানথা রেসিডেন্সিতে একটা বাড়ির দোতলায় সবাই মিলে চারদিন থাকলাম। চমৎকার জায়গা। বারান্দাতে বসেই সৈকত দেখা যায়। মাঝে মাঝে ভোরে ও সন্ধ্যায় দুজন সৈকতে হাঁটতে যাই। সমুদ্রের মুক্ত বাতাসে কয়েকটা দিন আনন্দে কেটে গেল। এই বাড়িতে প্রতিদিন নিজেদের রান্না করে খেতে হয়েছে। প্রতিদিন ছেলে বাজার করে আনত আর ওর বৌ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রান্না করত। ঢাকা থেকে চেন্নাই আসার সময় মেয়ে বার বার ওর মাকে বলে দিয়েছে, সে যেন কখনও রান্না করতে না যায়। কথা রেখেছিল মানুষটা।

ঐ চারদিন দুজন মিলে চেন্নাইয়ের নানা জায়গা বাসে করে ঘুরে বেড়িয়েছি। মেরিনা সৈকত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই রেডিও স্টেশন ও মিউজিয়াম দেখেছি।

চেন্নাই শহর ঐতিহাসিক দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য পল্লব, চোল, পাণ্ড্য এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পর্তুগিজরা ১৫২২ সালে এখানে বন্দর স্থাপন করেছিল। বন্দরটি ১৬১২ সালে ওলন্দাজদের অধীনে যায়। ১৬৩৯ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হয়। ১৭৪৬ সালে ফরাসিরা এই শহরসহ আশপাশের গ্রামগুলোকে দখল করে। ১৭৪৯ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৭ থেকে ৮ শতাব্দীতেও চেন্নাই সমুদ্রবন্দরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় মহাবলিপুরাম কমপ্লেসে সৈকত মন্দির দেখে। সেকালেও দূরদেশ থেকে আগত নাবিক ও পর্যটকেরা তাদের জাহাজ এখানে নোঙর করত। সৈকত মন্দিরটি শিলাখণ্ড খোদাই করে স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য এটি নির্মাণ করা হয়।

গাড়ি রিজার্ভ করে পন্ডিচেরি যাওয়ার পথে প্রায় দুঘণ্টা পথ অতিক্রম করে নাতিসহ আমরা সবাই এই স্থাপত্যকলা দেখে বিমোহিত হই। এই কমপ্লেক্সে পঞ্চরথ, ভরহা গুহা, কৃষ্ণ বাটার বল ও গঙ্গা নদীর দর্শনীয় পৌরাণিক বিভিন্ন কারুকাজ খচিত শিলাখণ্ড কাছাকাছি দূরত্বে পরিদর্শন করলাম।

শোর টেম্পল প্রবেশ পথে ছোটোখাটো মেলা থেকে পুত্রবধূ শাশুড়িকে পছন্দমতো দুটি পাথরের মালা কিনে দিলো।

পন্ডিচেরি ভারতের রং ও জীবনর্নির্ভর এক চমৎকার শহর। ছোটো শহর হলেও প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। চেন্নাই থেকে প্রায় দেড়শত কিলোমিটার দূরে এর অবস্থিতি। শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ফরাসি সভ্যতার নানা নিদর্শন। ফরাসিরাই এই শহরের গোড়াপত্তন করে। ১৬৭৪ সালে ফরাসি উপনিবেশ গড়ে ওঠে এখানে। এমনকি এক সময় ভারতের রাজধানী করা হয় শহরটিকে। এতে করে ফরাসি সভ্যতার আভিজাত্য শহরজুড়ে দৃষ্টি নন্দিত হয়। সেই সভ্যতার অবিকৃত রূপ এখনও চোখে পড়ে।

১৯৫৪ সালে ফরাসি সরকার উপনিবেশগুলো ভারতের কাছে বিনা শর্তে সমর্পণ করার পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পন্ডিচেরি প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে মিউজিয়াম, স্থাপত্যের দর্শনীয় চার্চ, ফ্রেঞ্চ ওয়ার মেমোরিয়াল দেখা শেষে সমুদ্রের সবুজাভ জলরাশি দেখে নাতি সৈকতে নামার জিদ ধরে। উঁচু পাড়ের নীচে পাথর বেষ্টিত সৈকতের পানিতে নামা বড়োদের জন্যেই কষ্টকর, সেখানে নাতির জিদ পূরণ করা কী করে সম্ভব?

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঋষি অরবিন্দ আশ্রমটি অত্যন্ত দর্শনীয়। আশ্রমের শান্ত পরিবেশ আর পুষ্পিত বিন্যাস দেখে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। গাড়িতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম বলে মন্দিরে আর যাওয়া হয়নি আমার।

পন্ডিচেরি পরিভ্রমণ শেষে সন্ধ্যার আগে জুহু বিচ আবাসের উদ্দেশে গাড়ি ছুটে চলল। বাসায় পৌঁছুতে বেশ রাত হলো। ক্লান্তিতে দাদুভাই গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন অন্য একটা গাড়ি একটানা দশদিনের জন্য রিজার্ভ করে সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়লাম। চেন্নাই ছেড়ে একে একে অনেকগুলো জায়গা ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে। স্বর্ণমন্দির দেখার পথে ম্যাগডোনাল রেস্তোরাঁয় গাড়ি থামিয়ে সকালের নাস্তা করতে ঢুকলাম। ম্যাগডোনালের খাবার খুব পছন্দ নাতির। নিজ হাতে একটু একটু করে খাবার খাওয়া হলো তার।

সবার খাওয়া শেষে নতুন উদ্যোমে আবার গাড়ি ছুটে চলল স্বর্ণমন্দিরের উদ্দেশে। এই মন্দিরটি ধন ও সমৃদ্ধির দেবী শ্রীলক্ষ্মীর প্রতি উৎসর্গিত। থিরুমালাইকোড়ির একটি ছোটো পাহাড়ের ওপর মন্দিরটি স্থাপিত। তামিলনাড়ুর ভেলোর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে।

শ্রী শক্তি আম্মা নামে ধর্মীয় এক নেতা এই মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১০০ একর জমির ওপর মনোমুগ্ধকর মন্দিরটি তৈরি করতে সাত বছর লেগেছিল। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণী ১৫০০ কেজি স্বর্ণ দিয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। স্থাপত্যের ব্যতিক্রমী শৈলীই লক্ষ্মী নারায়ণী মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। শিল্পকর্মটিতে তামার পাতের মধ্যে সোনার বার খচিত করা হয়েছে। পাতগুলোতে নিখুঁত নকশা খোদাই করা। মন্দিরের ফটক ও মাঝের পথ অর্থ মণ্ডপম সোনা দিয়ে মোড়ানো। সোনায় মণ্ডিত মন্দিরের গম্বুজ, অনেক দূর থেকে উজ্জ্বল দেখা যায়। এই মন্দিরে দেবী লক্ষ্মীর বৈভব অপূর্বভাবে উপস্থাপিত।

সনাতন ধর্ম অনুসারীদের কাছে এই মন্দির সোনার দেবীর আরাধ্যস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পর্যটকদের কাছেও স্বর্ণমন্দির অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

চেন্নাই থেকে গাড়িতে রওয়ানা দিয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা পর স্বর্ণমন্দির ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছুলাম। ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকেই মন্দিরের সৌন্দর্য অবলোকন করলাম। মন্দির ঘুরে দেখার ইচ্ছা পুত্রের থাকলেও আমরা রাজি হইনি। ক্যাম্পাসজুড়ে নানা সামগ্রী নিয়ে দোকানিরা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে। কেউ কিনছে, কেউবা ঘুরে ঘুরে দেখছে। আমরা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক সময় কাটিয়ে আবার গাড়িতে উঠলাম। ব্যাঙ্গালোরে রাত্রিযাপনের জন্য আগেই আবাস বুকিং করা ছিল। পথে কাঞ্চিপুরম এলাকায় শাড়ির

মার্কেটে কিছুক্ষণ গাড়ি থামিয়ে কিছু কেনাকাটা করা হলো। ছেলে-মার জন্য একটি কাঞ্চিবরণ শাড়ি কিনল। পুত্রবধু তার পছন্দের কিছু শাড়ি নিলো।

বেঙ্গালোরুতে পৌঁছে নাতি ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। কেয়ারটেকারের কাছ থেকে এপার্টমেন্টের চাবি নেবার ফাঁকে দু'তিন তলা সিঁড়ি বেয়ে নাতি উপরে উঠে গেছে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। দাদা কই, দাদা কই বলে দাদি আতঙ্কে খুঁজতে থাকে। শেষে তিনতলায় যেয়ে দুরন্ত নাতিকে পাওয়া গেল। কর্নাটক রাজ্যের রাজধানী বেঙ্গালুরু। এই শহরকে ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছে। ১৫৩৭ সালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গউড়া নামে এক জমিদার এখানে মাটির দুর্গ তৈরি করেছিলেন। তখন থেকেই এই শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬৩৮ সালে মারাঠারা শহরটি অধিকার করে এবং প্রায় ৫০ বছর তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এরপর মোগলরা শহরটি দখল করে। পরে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে মহীশুর রাজ্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তী সময়ে শহরটি মহীশুর রাজ্যের রাজধানী হয়। ১৯৫৬ সালে কন্নর ভাষাভুক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে নতুন কর্নাটক রাজ্য স্থাপিত হয়।

বেঙ্গালুরু শহরটির চারদিকে সুন্দর স্থাপত্য ভাস্কর্য, রাজপ্রাসাদ, বহু মন্দির ও সবুজ প্রকৃতি পরিবেষ্টিত মনোরম বহু উদ্যান রয়েছে।

পরেরদিন বেলা একটু বাড়তেই রিজার্ভ করা গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়ি। প্রায় দুঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে কিছু সিল্কের কাপড় কিনে মহীশুর রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে রওয়ানা দেই।

মহীশুর রাজপ্রাসাদ একটি দর্শনীয় স্থাপত্য। এর ভেতরে নানা স্মারক সংগ্রহ করা রয়েছে। ৪৮ মিটার উঁচু সেরাসেনিক শৈলীর এই রাজপ্রাসাদ অন্যতম পর্যটন স্থান। ১৩৯৯ সাল থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল মহীশুর। ১৫৫৩ সালে মহীশুর স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৬১ সালে রাজ্যের সেনাপ্রধান হায়দার আলীর উত্থান ঘটে। পরবর্তীতে তার পুত্র টিপু সুলতান মহীশুর রাজ্যের শাসক হন। ১৮৯৭ সালে দর্শনীয় প্রাসাদটি দশমী অনুষ্ঠান চলাকালে ভস্মীভূত হয়। ১৯১২ সালে প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ বাস্তুকার হেনরি আরউইনের প্রকৌশলজ্ঞানে রাজপ্রাসাদটি পুনঃনির্মিত হয়। বিশাল কমপ্লেক্সে অনুপম স্থাপত্য ভাস্কর্যে মোড়া গায়ত্রী, ভুবনেশ্বরী ও নবগ্রহ মন্দির খুবই মনোগ্রাহী। রয়েছে নানা অ্যান্টিক, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও অসাধারণ তৈলচিত্র। প্রতি সন্ধ্যাবেলায় প্রাসাদজুড়ে নিয়নবাতির আলোয় এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বিকেলবেলা আমরা মহীশুর রাজপ্রাসাদ কমপ্লেক্সে দর্শনীর বিনিময়ে প্রবেশ করলাম। মূল ফটক থেকে বেশ কিছুদূর পাড় হয়ে ডানদিকে সেই আরাধ্য প্রাসাদ দেখে অভিভূত আমরা। নাতি গুটিগুটি পায়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। সারাক্ষণ তাকে সামলাচ্ছে তার বাবা, কখনোবা তার দাদি। চত্বর ঘুরে দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কাটল।

সূর্য ঢলে পড়তে রাজপ্রাসাদের সামনে বাদক দল ও নিয়নবাতির আয়োজন সমাপন হলো। সুর, তাল ও ছন্দে বাদকরা তাদের শৈলী দেখানো শুরু করার সাথে সাথে নিয়নবাতির রঙিন আভা রাজপ্রাসাদটিকে মোহনীয় করে তুলল। বাবার কাঁধে উঠে তা দেখে আনন্দে মেতে ওঠে নাতি। ব্যারিকেডের বাইরে শত শত দর্শনার্থীও বিমোহিত।

অপূর্ব নিয়নবাতির আবহ কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। বুক করা মহীশুর কটেজে অগত্যা ফিরে আসি। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে শ্রান্তিতে দুচোখে ঘুম নেমে এলো।

পরেরদিন কর্ণাটক পাহাড়ের চূড়া থেকে মহীশুর রাজপ্রাসাদসহ পুরো শহরের নান্দনিক রূপ অবলোকন করলাম। তারপর নীলগিরি পর্বতমালার উপর দিয়ে উঁচু আঁকাবাঁকা সড়কপথে গাড়িতে প্রায় ৭ ঘণ্টা সুদীর্ঘ লম্বা ড্রাইভ দিলাম। পথের ধারে কখনও পাহাড়, বনানী ও অরণ্যের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

গোটা নীলগিরি পর্বতমালা উন্মুক্তভাবে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। পথে অনেক সময় হরিণ, বন বিড়াল, বানর ও শিয়াল এমনকি চিতাবাঘও চোখে পড়েছে। সেসব দেখে নাতি গাড়ির ভেতর খুশিতে ছটফট করতে থাকে।

একা একা পায়ে হেঁটে বা সাইকেল কিম্বা মটরসাইকেলে চড়ে পর্বতমালার রাস্তায় নামলেই বিপদ। বিভিন্ন পয়েন্টে বন বিভাগের প্রহরীরা সদা তৎপর। নিরাপদ দূরত্বে থেকে আচ্ছাদনে বসে যার যার দায়িত্ব পালন করছে।

নীলগিরি ঝরনা দেখার জন্য অরণ্য ছাড়িয়ে এক জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হলো। পাহাড় থেকে সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা নীচে সেই জলপ্রপাত। আমি নামার সাহস পেলাম না। নাতির সাথে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় দাদি। ঝরনার পানি দেখে শেষে উপরে ফিরে আসতে দাদির অবস্থা বেগতিক। আর তো পা চলে না। অবশেষে পুত্রের হাতে ভর দিয়ে এক পা এক পা করে উপরে উঠে আসে সে।

এরপর গাড়িতে দৃষ্টনন্দন ভারতীয় রানীসম নীলগিরি পর্বতমালার স্নিগ্ধশহর উটীর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। ঘণ্টা দুয়েক সর্পিল সড়কে পাহাড় বেয়ে, উটী শহর স্টেশন ছাড়িয়ে সমভূমি থেকে প্রায় ২০০০ মিটার উঁচু শিখরে বুককরা কটেজে যেয়ে উঠলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে আঁধার নেমে আসায় এলোমেলো পথে গাড়ির হেড লাইটে যতটা সম্ভব অরণ্য ঘেরা প্রকৃতি অবলোকন করেছি। সারাদিনের পরিভ্রমণে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফ্রেশ হয়ে সাথে করে আনা কিছু খাবার খেয়ে গা'টা এলিয়ে দিয়েছিলাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঝুল বারান্দায় পা দিতেই সূর্যোদয়ের অবিশ্বাস্য চমৎকার দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে চোখ দুটো ছানাবড়া। তুলার মতো মেঘের ভেলা যেন হাত দিয়ে অনায়াসে ধরা যায়। ঘরের মানুষটা পাখির মতো ডানা মেলার ভঙ্গিতে দুহাতে মেঘরাশিকে স্পর্শ করার আনন্দে পুলকিত হয়। পাহাড়ের উপরে-নীচে মেঘের ভেলা ভেসে আসছে– এমন দৃশ্য দেখে ঘরের মানুষটা অভিভূত। পরে মেঘরাশি উপরে উঠতে লাগল। কাছাকাছি আসতে শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। এ এক অপরূপ অনুভূতি। প্রকৃতি এত সুন্দর ভাবাই যায় না। এ দৃশ্য কল্পনারও অতীত ছিল। জীবনে বেঁচে থাকার এ-ও এক রকম সুখানুভব। ভাগ্যিস ছেলে এই সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের। অজান্তে চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

সকালবেলা কটেজ থেকে বের হয়ে পাহাড়ের ঢালে চা বাগান ঘুরে দেখলাম। দু-একটা পাতা তুলে সে কী খুশি সে। নীচ থেকে বহুদূর উপরে আমরা। পাহাড়ের থাকে থাকে চমৎকার সারিবদ্ধ ঘরবাড়ি দেখে খুব ভালো লাগছিল। কিছুক্ষণ এসব দৃশ্য দেখে কটেজে ফিরে আসি। ততক্ষণে দুতলা থেকে নেমে প্রশস্ত বারান্দায় আমাদের দেখে নাতি ছুটে এলো। মুখজুড়ে তার খুশির আমেজ। দাদির হাত ধরে এদিক-ওদিক হেঁটে নীল আকাশে মেঘের ভেলা দেখতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতমালার চারদিক সবুজে ঘেরা। পর্যটনের জন্য এ এক অনন্য সুন্দর স্থান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ওটী শহরকে সুইজারল্যান্ডের মনোরম শহরের সাথে তুলনা করা হয়।

নিরিবিলি এমন জাঁকজমক মনোরম জায়গা ভারতে খুব কমই পাওয়া যায়। নীলগিরি মাউন্টেইন রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন করে কুন্নুর থেকে সুন্দর শহর ওটী পর্যন্ত পরিব্রাজকদের জন্য টয়ট্রেনের প্রচলন করা হয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিব্রাজককে মুগ্ধ করে। চারদিকে চা বাগান, পাহাড়ি লেক, জলপ্রপাত, গোলাপ ফুলের বাগান, বোটানিক্যাল গার্ডেন খুবই দৃষ্টিনন্দন।

তিনদিন তিনরাত ওটী শহরের নানা দর্শনীয় স্থান ঘুরে নাতির মতো আমরাও মহা খুশি। এরপর কোচি শহর দেখার উদ্দেশে গাড়ি ছুটে চলল।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরালা অঙ্গরাজ্যের এরনাকুলাম জেলার একটি বন্দর শহর কোচি। এই শহরটি আরব সাগরের তীরে মালাবার উপকূলে অবস্থিত। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালি এবং পশ্চিম ঘাট থেকে আগত নদীসমূহের মোহনা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। বর্ষার সময় এখানে নৌ চলাচল করে। শুষ্ক মৌসুমে পানির গভীরতা কমে গেলে কোনো নৌ পরিবহণ চলাচল সম্ভব হয় না। শহরের বাইরে বড়ো জাহাজগুলো ৪ কিলোমিটার দূরে নোঙর করতে হয়।

১৫০০ সালে পর্তুগিজরা কোচি শহর দখল করে নিলে ভাস্কো দ্য গামা এখানে একটি কারখানা স্থাপন করে। পরে ১৫০৩ সালে পর্তুগিজরা ইউরোপীয়দের প্রথম দূর্গ নির্মাণ করে। এখান থেকেই ১৫৭৭ সালে ভারতে প্রথম অক্ষরে ছাপা বই প্রকাশিত হয়। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা পর্তুগিজদের বিতারিত করে। পরে ওলন্দাজেরা ১৬৬৩ সালে কোচি শহরকে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। ব্রিটিশের অধীনে থাকলেও ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ওলন্দাজরাই কোচি শহর শাসন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শতাব্দীকালের বেশি কোচি শহরটি অধিকারে রাখে। ১৯৩৬ সালে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে এলে কোচি শহর প্রধান বন্দরের মর্যাদা পায়।

কোচি শহরের উদ্দেশে প্রায় সাত ঘণ্টা লম্বা ড্রাইভ দেবার পথে ভারতবর্ষের প্রথম স্থাপিত মসজিদ দেখার জন্য থামলাম। চেরামন জুমা মসজিদ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরালার থ্রিশুর জেলা, মেথালা, আরাকুলাম কডুনগালুর তালুকে সরনার সড়কের পাশে অনেক বড়ো এলাকা নিয়ে মসজিদটি অবস্থিত। এটি নির্মাণ করেছিলেন সুলতান সিকান্দার। মসজিদের জন্য জমি দান করেছিলেন রাজা চেরামান পেরুমাল। মসজিদের ভেতরটা অবিকল সংরক্ষিত আছে। মসজিদের ইমামের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে মসজিদ প্রাঙ্গণের কিছু আলোকচিত্র তুললাম। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে মনোরম তোরণসহ বাঁধানো ঘাটের দৃষ্টিনন্দন একটি পুকুর রয়েছে। মসজিদের ডান পাশে প্রাচীন কবরস্থান।

চেরামন মসজিদ দর্শন শেষে প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক পথ পাড়ি দিয়ে আরব সাগরের কোচি সৈকতের কাছাকাছি বুক করা কটেজে এসে উঠলাম। ফ্রেশ হয়ে বিকেলবেলা কোচি সৈকতে ঘুরতে গেলাম। ছিমছাম সুন্দর পরিবেশ। সাগরের ফুরফুরে হাওয়ায় মন জুড়িয়ে গেল। নাতি ছুটে বেড়াতে লাগল খুশিতে। প্রচুর পরিব্রাজকের ঢল নেমেছে সৈকতে। আমরা কেউ পানিতে নামিনি। দূর থেকে সাগর দেখলাম। অনেকগুলো খাবারের দোকান রয়েছে সৈকতের একপাশে। সন্ধ্যার পর এক রেস্তোরাঁয় কেরালা পরোটা আর খাসির মাংস খেলাম। ঘরের মানুষটা শুধু সমুদ্রের মাছ খেয়েছে।

এক প্রতিবন্ধী ভদ্রলোককে দেখলাম বিজ্ঞানী হকিংসের মতো একটি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসে ছোট্ট একটি স্ক্রিনে কেবল দৃষ্টির ইঙ্গিতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পেছনে সাথের দুজন মেয়ে তাকে অনুসরণ করছেন। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। মানুষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কত না উন্নত সেবা দান করছে।

রাতে কোচি কটেজে অবস্থান করে সকালবেলা কেরালার আলিপ্প শহরের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আলিপ্পর তাম্বানদী বন্দরে। কেরালার অন্যতম সৌন্দর্য ব্যাকওয়াটার্স জলধারায় চালিত ঐতিহ্যবাহী হাউজবোট। আগে বুক করা তিনকক্ষ বিশিষ্ট একটি হাউজবোট অপেক্ষা করছিল তাম্বানদীর ঘাটে। কিছু লাগেজ সাথে নিয়ে সবাই হাউজবোটে উঠলাম। সারাদিন ও রাত বজরায় চড়ে তাম্বানদীতে ঘুরে বেড়াবো। এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। কল্পনাতে ছিল না, এমনকি স্বপ্নেও দেখিনি কোনোদিন। সেটাই বাস্তবে অনুভব করছি।

নীল সাগরের স্বচ্ছ জলধারা ব্যাকওয়াটার স্বপ্নের মতো সুন্দর জায়গা। মাঝারি খালের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে হাউজবোট। ব্যাকওয়াটার মূল নদী থেকে সৃষ্ট একটি শাখা। সাধারণত নদীর গতিপথে সরুমুখ বিশিষ্ট নিম্নভূমিজুড়ে এই ব্যাকওয়াটার।

বজরায় চড়ে নাতির আনন্দ দেখে কে? একই অবস্থা আমাদেরও। সম্ভবত এর আগে ছেলে তার বউকে নিয়ে এমন করে ঘুরে বেড়িয়েছে। বজরা চলার সাথে সাথে আমাদের আনন্দ উপচে পড়ে। দুধারে অসংখ্য হাউজবোট চোখে পড়ছে। কোনোটা পাশ কাটিয়ে পেছনে যাচ্ছে, কোনোটা সামনে দেখা যাচ্ছে। কোনোটা থেকে হই-হুল্লোড় বাদ্যযন্ত্রের সুর ভেসে আসছে। সবাই যেন আনন্দ ভ্রমণে বেড়িয়েছে। জীবনে অজানা কত না বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এসবের কিছুই দীর্ঘ জীবনে কখনও টের পাইনি। দুইপাশে গাছগাছালি, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের বাড়ি। চারপাশে জলরাশির মাঝখানে ছোটো ছোটো গ্রাম।

হাউজবোটগুলো দেখতে খুবই চমৎকার। কাঠ, বাঁশ আর ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। ডাইনিং, ড্রইং, শীতাতপ বেডরুমসহ একটি ফ্ল্যাটের সব সুবিধা রয়েছে। বিগস্ক্রিন এলইডি টিভি ও ডিভিডি প্লেয়ারও আছে বিনোদনের জন্য।

কিছুক্ষণ পরপর হালকা নাস্তা আসছে, ফলের জুস আসছে। সেসবে নাতির আগ্রহ নেই। তার আনন্দ আধো আধো বাংলা ইংরেজি মিশানো ভাষায় আমাদের সাথে ভাব বিনিময়ে। বজরার সামনের অংশটা খোলামেলা। গলুইয়ে বসে সারেং বজরা নিয়ন্ত্রণ করছে। এর পরেই খোলা জায়গায় ড্রইং ও ডাইনিং। দুপাশে সোফা আর মাঝখানে ডাইনিং টেবিল ও ছয়টি চেয়ার পাতা। দেয়ালে লাগানো টেলিভিশন স্ক্রিন। এর পেছনে পরপর চারটি কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষের সাথেই এটাচ বাথ। দুদিকেই জানালা। ডাবল খাটের ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক সাজে সকল সুবিধাই ভোগ করা যাচ্ছে। বজরার লোকজনের জন্য একটি কক্ষ ও আলাদা কিচেন রয়েছে। বনেদি কায়দায় উপভোগ করার যাবতীয় আয়োজন এখানে বিদ্যমান।

নাতি মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। আমি মোবাইলে চারদিকের ছবি তুলছিলাম বলে টের পাইনি। তাতে নাতি মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে। পরে বুঝিয়ে শান্ত করা গেল।

ধীর গতিতে বজরা এগিয়ে চলেছে। এক সময় দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হলো। রাজকীয় আয়োজন। সামুদ্রিক মজাদার ভাজা মাছ, ডাল, ভাত, ভর্তা, সবজি ও নানা উপাদেয় উপকরণ। খাবার শেষে বেডরুমে যেয়ে বিশ্রাম।

বিকেলে বেশনে ভিজিয়ে কাঁচকলা ভাজা খেতে খুব ভালো লাগল।

পরে চা খেলাম। পড়ন্ত সূর্যালোকে বজরা থেকে চমৎকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলাম। সন্ধ্যার পর একটি গ্রামে নোঙর করল বজরা। সারারাত এখানেই বাঁধা থাকবে। রাতের খাবারে গলদা চিংড়ি ভাজা, মুরগি আর উপাদেয় ঘন মুগের ডাল ও রুটি খেয়ে পরিতৃপ্তি পেলাম। রাতে প্রশান্তিতে ঘুমালাম।

পরের দিন সকালে নাস্তা করার পর বজরা ঘাটের দিকে রওয়ানা দিলো। অনাস্বাদিত হাউজবোট ভ্রমণ বেলা ৯টার দিকে পরিসমাপ্তি ঘটল।

সময়মতো ঘাটের পাশেই গাড়ি পার্ক করা ছিল। আমরা তাতে গিয়ে উঠলাম।

এখন গাড়ি ছুটে যাবে কুমিলীর উদ্দেশে। কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত অরণ্যে শোভিত কুমিলী গ্রাম পঞ্চায়েত। থরে থরে সাজানো চা বাগান। সুন্দর পরিপাটি সবুজাভ গ্রাম। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানকার আবহাওয়াও চমৎকার। একসময় থেক্কুমকুর রাজার কেন্দ্রীয় ট্রেবাঙ্কর এর আওতাধীন ছিল। পরে মারথান্দা ভার্মার কর্তৃত্বাধীনে আসে।

ব্রিটিশ আমলে এই এলাকায় শস্যের চাষাবাদ শুরু হয়। করডামন, পেপের, চা, কফি, চিন্নামন ইত্যাদি ফসল উৎপন্ন করা হতো। নানা ভেষজ মশলা উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত।

প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা জার্নির পর কুমিলী পৌঁছুলাম। পাহাড়ের উপরে বুক করা কটেজে উঠে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া শেষে বিশ্রাম নিলাম। বিকেলবেলা নাতিকে নিয়ে ছেলে ও বউ বনের হাতি দেখতে গেল। আমরা কটেজেই সময় কাটালাম।

একটানা নয়দিন ধরে জার্নির উপরে আছি। বয়সি মানুষ দুজন। ধকল তো একটু পোহাতেই হবে। জীবনে এমন অবস্থার মুখোমুখি হইনি কোনোদিন। ভ্রমণের উপযুক্ত সময়ে এর মাহাত্ম অনুভবের সুযোগ হয়নি। সংসারের পিছনেই ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে। অর্থ, রশদ ও আয়োজন কল্পনাতীত ছিল। অনেক কিছুই উপভোগের আওতায় আসেনি। অবশ্য তা নিয়ে কখনও হাহুতাশ করিনি কেউ। অজান্তেই কেটে গেছে সুদীর্ঘ কাল।

ভারত পরিভ্রমণের চাইতে সন্তান ও উত্তরাধিকারের একান্ত সান্নিধ্য পাওয়াই আমাদের লক্ষ্য ছিল। তা কি পেয়েছি? হয়ত পেয়েছি কিংবা পাইনি। একটা যৌথ পরিবার কত অনায়াসে যোজন যোজন দূরত্বে চলে যায়। বেড়াতে এসে অনেকদিন ধরে পাশাপাশি আছি। কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া পাচ্ছি কি? দুদণ্ড মা-বাবার সাথে আন্তরিক মেলামেশা বা আলাপচারিতার সময় পাচ্ছে কি সন্তান? তাৎক্ষণিক ভ্রমণ দৃশ্যকল্পের সঞ্চয় ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি কি বুকের ভেতর নিয়ে ফিরতে পারব?

সকালবেলা মাদুরাই রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য রওয়ানা দিলাম। এটাই আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান। প্রায় ৪ ঘণ্টা পর মাদুরা পৌঁছে বুক করা কটেজে উঠলাম। দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিছানায় বসে মোবাইলের ছবিগুলো দেখছিলাম। আচমকা পেছন থেকে ঘাড়ে দুবার আঘাত করল নাতি। ছোট্ট হাতে এত শক্তি ভাবা যায় না। মাথাটা কেমন ঝিম ধরে গেল। আমি আড়চোখে তাকিয়ে বিরক্তি নিয়ে বললাম, কী ডাকাত ছেলেরে বাবা। যাও তোমার সাথে আড়ি। কে শোনে কার কথা? বিছানার উপর তার মতো সে খেলতে থাকে। বিকেল হতে মাদুরাই রাজপ্রাসাদ দেখতে বের হলাম। দেড়ঘণ্টা পর পৌঁছুলাম রাজবাড়িতে।

ভারতের তামিলনাড়ুতে মাদুরাই শহর অবস্থিত। ১৩৩৫ সালে মাদুরাইয়ের ভাইসরয় জালালুদ্দিন আহসান খান দিল্লির সুলতানের অধীনতা থেকে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। আহসান খান ও তার বংশধর ১৩৭৮ সাল পর্যন্ত মাদুরাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শাসন করেছিলেন। শেষ সুলতান আলাউদ্দিন সিকান্দর শাহ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কুমার কাম্পানার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে মাদুরাই সালতানাত হাতছাড়া হয়ে যায়। সুলতানি আমলের ৪৩ বছরে মোট ৮ জন পর্যায়ক্রমে শাসক ছিলেন। মাদুরাইয়ে মুসলিম রাজত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল দ্বিতীয় পাণ্ড সাম্রাজ্য পতনের পর।

বিকেলবেলা রাজপ্রাসাদ দেখা শেষ হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মীনাক্ষী আম্মান মন্দিরে পৌঁছুলাম। ভাইগাই নদীর দক্ষিণ তীরে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি দেবী পার্বতীর মীনাক্ষী রূপ ও শিবের সুন্দরেশ্বর রূপের উদ্দেশে নিবেদিত। এটা মাদুরাইয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এটি নির্মিত হয়। মাদুরাই শহরের মূল মন্দির থেকে শহরের যোগাযোগের সড়কগুলো বিভিন্ন দিকে বিস্তার করার পরিকল্পনার জন্য দেবী মীনাক্ষীকে দৈবিক শাসিকা হিসেবে গণ্য করা হতো। মন্দিরটি বহু গুণীজনদের মিলনস্থল বলে বিবেচিত ছিল।

সুলতানদের আধিপত্যকালে ১৩১০ সালে মুসলিম সেনাধক্য মালিক কাফুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই মন্দির দখল ও লুটতরাজ করে। মালিক কাফুর একে একে মাদুরাইসহ চিদম্বরম, শ্রীরঙ্গম শহরগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে মন্দিরগুলোকে ধ্বংসের সাথে সাথে সোনা-গয়না লুট করে। এক পর্যায়ে মন্দিরগুলো থেকে রাজস্বও আদায় করা হতো। পরবর্তীকালে বিজয়নগরের শাসকগণ মীনাক্ষী মন্দিরের ভগ্নাবস্থা কাটিয়ে ভক্তদের প্রার্থনার জন্য মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করান।

সন্ধ্যার পর মন্দিরটি ঘুরে দেখার জন্য ছেলে ও বউ, নাতিকে আমাদের কাছে রেখে ভেতরে প্রবেশ করে। নাতি বাবার সাথে যাবে বলে ছটফট করতে থাকে। কিছুতেই থামানো যায় না। কি করা যায়? এদিক-ওদিক দাদি কোলে নিয়ে মানাবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ পর তার জিদ থামে।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পার করে ছেলে আর বউ ফিরে এলে নাতির শান্তি হয়। এরপর মেদুরাই কটেজের পথে গাড়ি চলতে থাকে। একরাত ওখানেই থাকব আমরা। পরের দিন সকালবেলা রওয়ানা দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চেন্নাই শহরে বুক করা কমপ্লেক্স এপার্টমেন্টে যেয়ে উঠি। ছোট্ট গাড়িতে লাগেজ রাখার জায়গায় প্রায় দশদিন কী অসহ্যভাবে ভ্রমণ করেছি ভাবাও যায় না। কিন্ত ভ্রমণের আনন্দে সেটা অনুভব করতে পারিনি। চেন্নাইতে এক মাস না পেরুতেই ঢাকায় চলে আসব বলে ছেলেকে প্লেনের টিকিট কাটতে বলি।

পরের দিন সকালে কী মনে করে চেকআপ করাতে নিয়ে গেল আমাদের। চেন্নাই স্টেশনের কাছে আম্মা হাসপাতালে দুজনের চেকআপ হলো। প্রেসার দেখে নার্স জানালো রক্তে অনেক উচ্চচাপ। হতেই পারে, এ বয়সে একটানা জার্নির ধকল সইতে পারা কম কথা নয়।

এরপরে রিপোর্ট না নিয়েই ভোরের ফ্লাইটে চেন্নাই থেকে কলকাতা যেতে হলো। সেখানে দুই দিন অপেক্ষার পর নির্ধারিত ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে আসি।

অবিশ্বাস্য এ ভ্রমণের নাম যদি সুখ দেওয়া হয় তাহলে সেটাই আমাদের প্রাপ্তি। তবে এ সুখ আমরা ঘন ঘন পেতে চাইনে। অক্ষয় হয়ে থাকুক সুখ নামের এই ভ্রমণপাখি।

৩৬ জুলাই
গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ
প্রথম খণ্ড

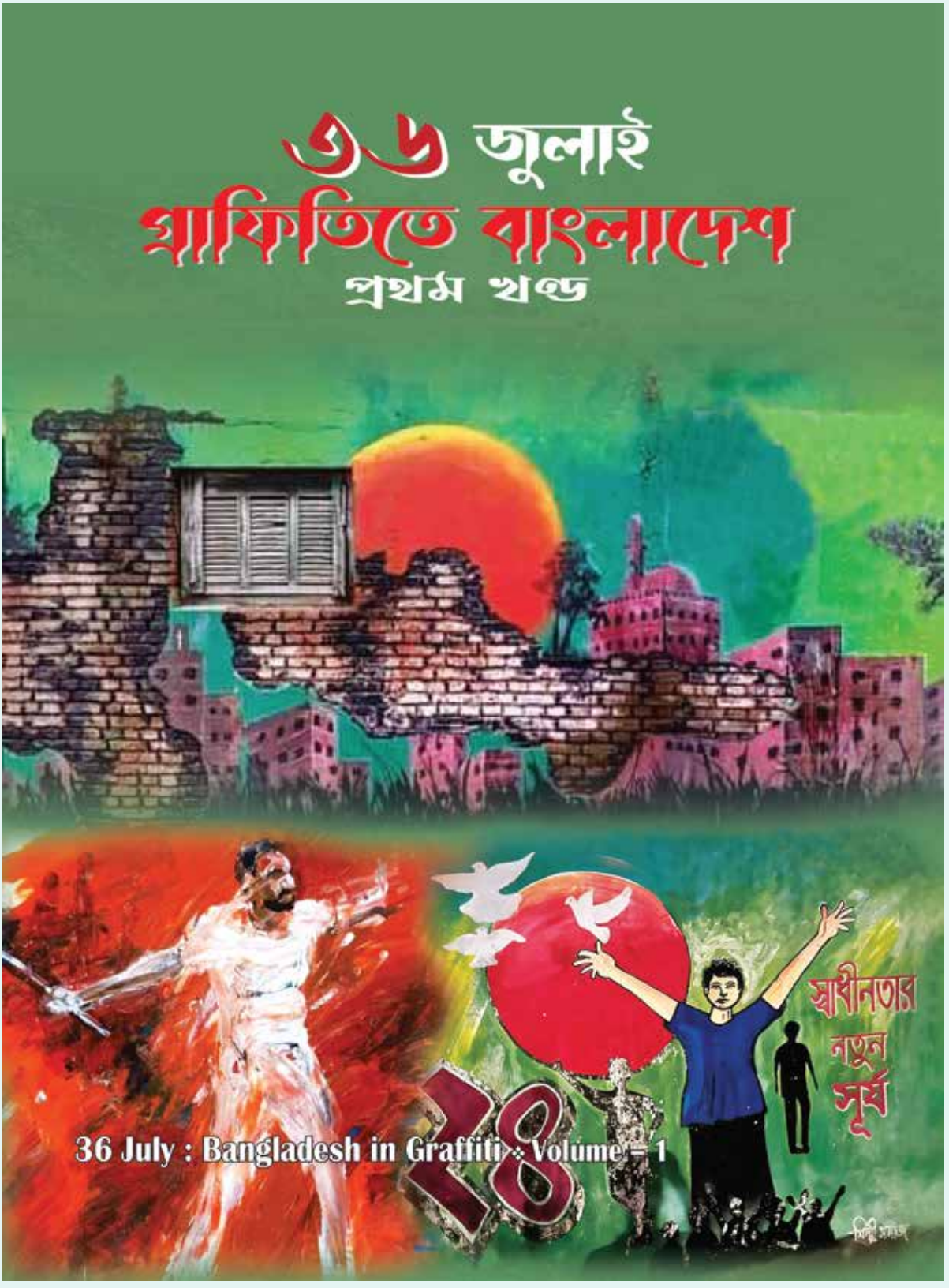

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 02, August 2025, Tk. 25.00

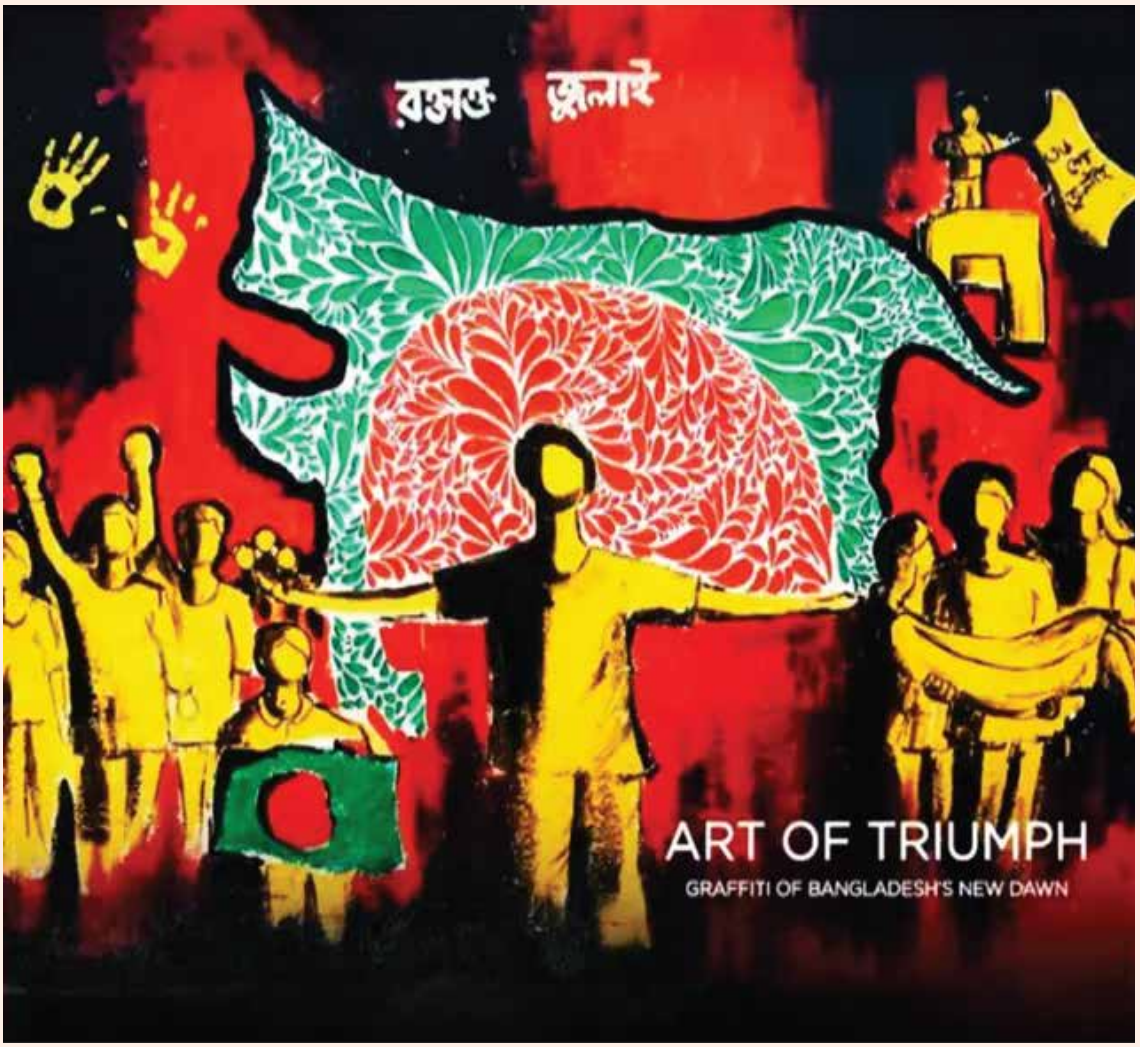

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd